ব্রহ্মর্ষি সন্তদাস

ও

তাঁহার অমৃতবাণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ

অধ্যাপক, যাঁদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ও

তাঁহার অমৃতবাণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম. এ

অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য—২.৫০ (টাকা)

মুখবন্ধ

আজ ২৪শে বৈশাখ ১৩৭৭ (ইং ৮.৫।৭০) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সুখচর কাঠিয়া বাবার আশ্রমে শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা দিবস। "স্বামী সন্তদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতির" সভ্য এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবার অনন্য ভক্ত; তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ বহুকাল হইতে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার স্বরূপটি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহা আমি তাঁহার সহিত পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বুঝিয়াছি। তাঁহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ পুস্তিকা লিখিবার জন্য বলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য অদ্যকার এই শুভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট এবং জনসাধারণের নিকট সংক্ষেপে তাঁহার স্বরূপটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হউক। শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ তাঁহার গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে একটি জীবনালেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইহা নিশ্চিত যে শ্রীগুরুদেবই স্বয়ং তাঁহার অন্তরে প্রেরণা দিয়া ইহা লিখাইয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা ব্যতিরেকে এরূপ একটি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশক হৃদয়গ্রাহী পরম কল্যাণকর পুস্তিকা রচনা করা অসম্ভব।

শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়াও এই পুস্তিকাতে যে ভাবে তাঁহার স্বরূপটি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে তাঁহার স্বরূপ গভীরভাবে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সার্ব্বভৌম। তিনি সেই বিদ্যার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। অতএব তিনি সকলের জন্যই। সত্যানুসন্ধিৎসু মুমুক্ষু মানব মাত্রেই তিনি পরম কারুণিক আচার্য্য—তাঁহার প্রতি শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদের শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও উক্ত প্রকার উপলব্ধি তাহাই প্রমাণিত করে।

পুস্তিকাখানি অতি সহজ ও সরল ভাষায় অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা সহকারে লিখিত বলিয়া তাঁহার স্বরূপটি যথার্থই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশক একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছে।

এই স্বল্পায়তন পরম উপাদেয় গ্রন্থখানি উক্ত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকাশ করা হইল। আশা করি এই "ব্রহ্মর্ষি-সন্তদাস" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ ব্রহ্মর্ষি-স্বরূপ যথাযথরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রভূত কল্যাণ ও পরম আনন্দ লাভ করিবেন। ইত্যলম্

শ্রীধনঞ্জয় দাস

ভূমিকা

"স্বামী সন্তদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতি"র পক্ষ থেকে ব্রহ্মর্ষি সন্তদাসজী মহারাজের অমূল্য গ্রন্থাবলী হতে নির্বাচিত কিছু কিছু অংশ গ্রথিত করে এই সার সঙ্কলন "ব্রহ্মর্ষি সন্তদাস ও তাঁহার অমৃতবাণী" প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থের প্রথমে শ্রীশ্রীসন্তদাস স্বামীজী মহারাজের ব্রহ্মর্ষি-চরিত্র-মহিমা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তারপর তাঁর অমৃতোপম উপদেশের সার-সংগ্রহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র। এটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য, সন্তদাসজী মহারাজের মূল, সম্পূর্ণ গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের জন্য জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত করা। আর একটি উদ্দেশ্য যাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই এই ব্রহ্মর্ষি পুরুষের প্রশান্ত-গম্ভীর মুখমণ্ডল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আরক্তিম হয়ে উঠত, সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদের প্রণীত আর্ষশাস্ত্রের প্রতি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের ঔৎসুক্য উদ্রিক্ত করা।

শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সন্তদাস স্বামীজীর কাছে প্রথম উত্থাপিত হলে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ব্রহ্মচারী (বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁরই) মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, "তোরা আমার বইগুলোই কেউ ভাল করে পড়লি না, আশ্রম করে আর কি হবে।" এই গ্রন্থ প্রনয়ণকালে এই কথাটাই বার বার মনে হয়েছে।

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাসজী মহারাজের উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ এই সঙ্কলন-রচনার মূল প্রবর্তক। তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর পরমারাধ্য ব্রহ্মর্ষি-প্রতিম গুরুদেবেরই আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে, গ্রন্থকারের এই দৃঢ় বিশ্বাস।

অক্ষয় তৃতীয়া, ২৪শে বৈশাখ,
১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য
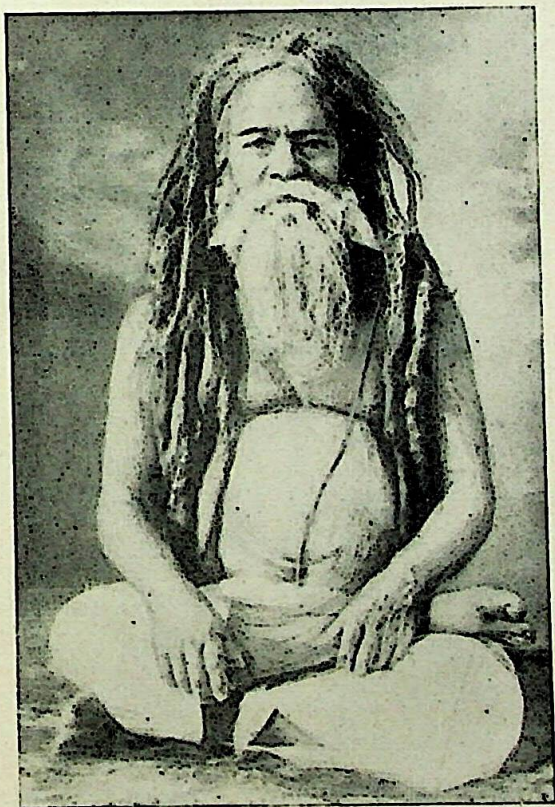
ব্রহ্মর্ষি সন্তদাস ও তাঁহার অমৃতবাণী

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থের রচনাকালে যখন প্রশ্নের উত্তর বলে যেতেন তখন তাঁর গুরুদেবের উদ্ভাসিত মুখাবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হত তিনি যেন সমস্ত তত্ত্ব চিন্তা করে নয়, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করে বলে যাচ্ছেন; মনে হত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর কাছে করতলন্যস্ত-আমলকবৎ। কথাটা যে কত বড় সত্য তা ঐ আশ্চর্য গ্রন্থটি পাঠ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়। শাস্ত্রে ঋষিদের বলা হয়েছে "তত্ত্বদর্শী", অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে তার "তত্ত্ব" বা যথার্থ স্বরূপ তাঁরা "দর্শন" করেছিলেন। সন্তদাস স্বামী ছিলেন আধুনিক কালে লুপ্তপ্রায় এইরূপ একজন পূর্ণতত্ত্বদর্শী পুরুষ। প্রাচীন ব্রহ্মর্ষি পুরুষদের বর্ণনা যে শাস্ত্রকারদের কল্পনা মাত্র নয়, তাঁরা যে এখনো আবির্ভূত হন ক্বচিৎ কদাচিৎ এই ম্লানগৌরব বর্তমান ভারতভূমিতে তার প্রমাণ এই মহাপুরুষ। মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই বাংলাদেশে, এই কলকাতা শহরের কাছেই এমন একজন ব্যাস-বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্য-প্রতিম ব্রহ্মর্ষি স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন, একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়; বারংবার শ্রবণে ঝঙ্কৃত হতে থাকে তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের তাঁরই রচিত অপূর্ব জীবন-চরিতের অবিস্মরণীয় অন্তিম বাক্যটি: "এই ভারতভূমি

বস্তুতঃই ধন্যা ; কারণ অদ্যাপি এবংবিধ ব্রহ্মর্ষি এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা বিস্তার করতঃ এই ভূমিকে পবিত্র করিতেছেন।”

স্বয়ং পূর্ণতত্ত্বদর্শী পুরুষ হয়েও কিন্তু এই ব্রহ্মর্ষি শাস্ত্র লঙ্ঘন করে কখনো একটি বাক্যও বলেন নি, যখনই যা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ দিয়েছেন, বলেছেন ঋষিরা এই কথাই বলে গেছেন। এতবড় মনীষী ও সত্যদ্রষ্টা পুরুষ হয়েও কখনো বলেন নি তিনি কোন নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, যা ঋষিরা জানতেন না। তাঁর জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁর ছিল প্রাচীন ঋষিদের প্রতি। দুটি প্রসঙ্গ ছিল যা উত্থাপিত হতে না হতেই এত বড় গম্ভীরাত্মা পুরুষও গদ্‌গদ হয়ে উঠতেন, কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ ও দৃষ্টি আর্দ্র হয়ে আসত : একটি তাঁর গুরুদেবের প্রসঙ্গ, আর একটি ঋষিদের। একবার ঋষিদের কাছে অনাবিষ্কৃত নূতন সত্য কিছু আছে কিনা এই কথা ওঠায় তিনি জনৈক শিষ্যকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, “তাই যদি হবে তা হলে তোমরা আবার তাঁদের ত্রিকালজ্ঞ বল কি করে ; তা হলে তো “ত্রিকালজ্ঞ” শব্দটাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।” সাধকের এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অন্তিম লক্ষ্য তাঁর মতে নূতন সত্য আবিষ্কার নয়, শাশ্বত সত্য, যা প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিদের দিব্যনেত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল তাকেই নিজে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা।

কথাটা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ ইদানীং এই ভারতবর্ষেই কোন কোন মনীষী সাধক একথা স্বীকার করেননি। তাঁদের মত হচ্ছে—প্রাচীন শাস্ত্রকার ঋষিরা অসাধারণ পুরুষ ছিলেন

সন্দেহ নেই, শ্রদ্ধার পাত্রও নিশ্চয়ই, তবে তাঁরা যে চরম সত্য সাক্ষাৎকার করেছিলেন এ ধারণা অন্ধ মূঢ়তা মাত্র; সত্য কখনো নিঃশেষিত হতে পারে না, যুগে যুগে নব নব সত্য নিত্য আবিস্কৃত হয়ে চলেছে এবং চলবে। কাজেই মানতেই হবে এমন অনেক সত্য আছে যা ঋষিদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। শেষ কথা (last word) আজও বলা হয়নি, হয়ত কোনো দিনই হবে না।

সন্তদাসজী কিন্তু একথা বলেন নি। বিশ্বরহস্য সর্বজ্ঞ ঋষিদের ধ্যাননেত্রে নিঃশেষে অপাবৃত হয়েছিল এই ভারতবর্ষেই, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে—এই কথাই তিনি বিশ্বাস করতেন। সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা এই ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয়েছিল উপনিষদ্-এর প্রবক্তা ঋষিদের কাছে; আর উপনিষদ্ বলছেন ব্রহ্মের জ্ঞান হলে এই অনন্ত বিশ্বের কিছুই আর অজানা থাকে না; যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হলে মৃন্ময় সব কিছুই জানা হয়ে যায়, তেমনি বিশ্বের মূল কারণ যিনি তাঁকে জানলে অবিদিত কিছুই থাকে না। তাই ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে শ্রুতি বলেছেন সর্ববিৎ, অর্থাৎ ধ্যানমাত্র তিনি ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব তৎক্ষণাৎ অবগত হতে পারেন।

"ব্রহ্মবিৎ" কথাটার যথার্থ তাৎপর্য, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও মহিমা তিনি যেভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছিলেন সেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, সাধারণ লোকের কোন ধারণাই নেই আর বাস্তবিক থাকা সম্ভবও নয়। "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থে বিশ্বামিত্র ও সৌভরি মুনির নানা অলৌকিক

ঐশ্বর্যের ও যোগবিভূতির বর্ণনা করে তিনি বলেছেন তখনো তাঁরা ব্রহ্মবিৎ হননি, হয়েছিলেন তার অনেক পরে, অনেক দীর্ঘ, কঠোর তপশ্চর্যার অন্তে। তারপরেই মন্তব্য করেছেন: "ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণের সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন" (গুরু-শিষ্য-সংবাদ, পৃঃ ১৩৯)। অবতার-তত্ত্ব এবং অবতারোপাসনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন নানা স্থানে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন— অবতার হলেই যে তিনি অভ্রান্ত, পূর্ণসত্যদর্শী হবেন তার কোন মানে নেই। শুধু তাই নয়; আরো বলেছেন—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলে, যে কোন অবতারের চেয়ে বেশি। কথাটা হঠাৎ শুনলে চম্‌কে ওঠবার মত; অথচ কথাটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত।

অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা ছিল এই মহাপুরুষের। তাই কখনো কখনো অনেকের পক্ষেই অপ্রীতিকর অথচ সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত সত্য সত্যের অনুরোধেই যেন প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছি; আর একটার উল্লেখ না করে পারছি না।

সন্তদাস স্বামীজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিই ঐ (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন; একথাও বলেছেন বারবার যে কৃষ্ণাবতারে যেরূপ পরিপূর্ণ জ্ঞানৈশ্বর্যের প্রকাশ ঘটেছিল তা অন্য কোন অবতারে দৃষ্ট হয় না। অথচ সেই সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের দেহ সাধারণ জীবদেহ, এমন কি মুক্ত পুরুষের

দেহ থেকেও স্বতন্ত্র হলেও "মূল প্রকৃতির বিকার" এই অর্থে "প্রাকৃত"। কথাটা নিয়ে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবসমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল; হওয়ারই কথা। শুধু তাই নয়, অর্জুনকে তিনি যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, তাও তিনি এই ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত বলেই অভিহিত করেছেন। তারপর, শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যেরূপ দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কর্ম ক্ষীণ হয়, এবং সংসারপাশ হতে জীব মুক্ত হন বলে শ্রুতি বর্ণনা করেছেন তা কোন "রূপই" নয়—তা অমূর্ত এবং চিদানন্দময়।

এ প্রসঙ্গে আর একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সন্তদাস স্বামীজী পরম বৈষ্ণব হয়েও চরম তত্ত্বের আলোচনায় সর্বত্র সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন শ্রুতির; বার বার বলেছেন ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ শ্রুতি, এবং স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের বিরোধী কোন বাক্য, এমন কি শাস্ত্রবাক্যও গ্রহণীয় নয়। (অবশ্য এখানে শাস্ত্রের অর্থবাদ বাক্যসমূহই তিনি বলতে চেয়েছেন, নচেৎ কোন আর্য বাক্যই শ্রুতি-বিরোধী হতে পারে না)।

কথাটা হয়ত অনেকের কাছেই বৈষ্ণবোচিত মনে হবে না, কারণ বৈষ্ণবসমাজের অনেকেই, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, শ্রীমদ্ভাগবতকেই শাস্ত্রগ্রন্থ-মধ্যে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করেন। সন্তদাস স্বামীজীও স্বয়ং মোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন, এবং তত্ত্ববিচারে নানাস্থানে ভাগবত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বিস্তৃতভাবে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি বেদান্তের ভাষ্যরূপেই গ্রহণ করেছেন, এবং বলেছেন, ভাগবত থেকেই প্রমাণ

উপস্থাপিত করে, যে ভাগবতের প্রধান আলোচ্য বিষয় শ্রুতি-প্রতিপাদ্য সেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ভাগবতোক্ত সাধনার একমাত্র লক্ষ্য "কৈবল্য" বা "মোক্ষ" (কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্) ।

এদিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সন্তদাস স্বামীজী নিম্বার্ক-শঙ্কর-রামানুজ-প্রমুখ বেদান্ত-ভাষ্য-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ আচার্য-বৃন্দের অনুসৃত চিরাচরিত ধারারই অনুবর্তন করেছেন। (প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, ধীশক্তির প্রখরতায়, বিচার-বিশ্লেষণের অসামান্য নৈপুণ্যে তিনি পূর্বোক্ত আচার্যদের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয়; আর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির দিক্ থেকে বিচার করলে এঁদের চেয়ে তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না; "বেদান্ত দর্শনের" নানা স্থানে আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত সকল যেভাবে তিনি খণ্ডন করেছেন অমোঘ, ক্ষুরধার যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ-সহকারে, তা শংকরাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরই উপযুক্ত)। অর্থাৎ তত্ত্ব-নিরূপণে প্রামাণিকতার দিক্ থেকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন "প্রস্থান-ত্রয়"কে, (শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা); শ্রুতি সর্বাগ্রে, তার পরেই ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা। অন্যান্য শাস্ত্র হতে (বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত) প্রমাণ প্রচুর উদ্ধৃত করেছেন, গুরুত্বও দিয়েছেন যথেষ্ট, কিন্তু তা শ্রুতিবাক্যের সমর্থন এবং স্পষ্টীকরণ করতে গিয়ে।

এথেকে কেউ যেন মনে না করেন বেদান্ত-বহির্ভূত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থকে তিনি প্রামাণিকতার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। আর্ষগ্রন্থ-মাত্রই সাধকের কাছে পরম আদরণীয়—একথা তিনি বহুবার

বলেছেন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতেন। একবার-তখন তিনি গৃহী—এক দুর্ঘটনায় তাঁর চোখে দারুণ আঘাত লাগে। নিজে পড়তে পারতেন না; একটি মেয়ে তাঁকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করে শোনাত, আর তিনি তন্ময় হয়ে শুনতেন। পরবর্তিকালে বলেছেন, সে সময় তাঁর সমগ্র শরীর যেন "রামময়" হয়ে যেত; অথচ রামায়ণে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রসঙ্গ অতি অল্পই আছে। এমন কি একথাও বলেছেন, অন্য গ্রন্থ যতই উপাদেয় হোক, ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে না।

তবে একথাও তিনি বলেছেন স্পষ্ট ভাষায় (তাঁর ভাষা ছিল সর্বদাই স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; হেঁয়ালি কোথাও নেই)। যে পুরাণাদি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে আর্ষ, অতএব প্রামাণিক বলে গণ্য এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয় হলেও এসকল অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারীর (অর্থাৎ সর্ব-সাধারণের) জন্যই পরম কারুণিক ঋষিগণ রচনা করেছিলেন। আর এখানে "কনিষ্ঠাধিকারীর" অর্থ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা যাঁরা সম্যক্ ধারণা করতে অসমর্থ।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। শাস্ত্র-বাক্য সম্পূর্ণ সত্য একথা তিনি যেমন বলতেন, তেমনি এও বলেছেন যে সত্যের মধ্যেও তারতম্য আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "গুরু-শিষ্য-সংবাদ"এ শত্রু ও পাপিষ্ঠের প্রতি কি করে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে বললেন বাস্তবিক কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না, আমরা লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ যা কিছু এই জন্মে ভোগ করি তা সবই আমাদের "পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মের ফল"

("স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ"—অন্যত্র উদ্ধৃত করেছেন)। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই পর্যন্ত বলেই তিনি থামলেন না ; বললেন একথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এর চেয়েও উচ্চতর সত্য হচ্ছে—"পাপ পুণ্য সমস্তই মূলতঃ ঈশ্বরাধীন, জীবের স্বতন্ত্ররূপে কর্মসামর্থ্য কিছুই নাই। কারণ :—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" গীতা ১৮।৬১

একথা যিনি অনুভব করেন তিনি "সর্বত্র সমদর্শী" হন এবং তাঁর "আভ্যন্তরিক শান্তির কদাপি চ্যুতি হয় না।"

আশ্চর্য এই, এতদূর পর্যন্ত এসেও তিনি থামলেন না। বললেন এ অতি উচ্চ অবস্থা, কিন্তু শেষ অবস্থা নয়, চরম সত্য এরও পরে। কিন্তু এর চেয়েও উচ্চতর অবস্থা, উচ্চতর সত্য কি কিছু হতে পারে?—স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে উদিত হবে। সন্তদাসজী বলেছেন—হাঁ, হতে পারে—সেই হল চরম অবস্থা, পরম সত্য, বেদান্তের "গুহ্যতম সার"। কি সেই সত্য, কি সেই অনুভূতি? "পরন্তু যিনি গুরূপদিষ্ট বেদান্ত-বাক্যের গুহ্যতম সার অবগত হইয়া আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সর্বজীবের সর্ববিধ অবস্থা অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বর্তমান আছে, তাঁহার ঈক্ষণশক্তি প্রভাবে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র।...সুতরাং এবংবিধ পুরুষ সাংসারিক সুখদুঃখাদি সকলেরই অতীত। তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়।"

এই হল যথার্থ ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অনুভূতি এবং এ বর্ণনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি নিজে ঐ স্তরে পৌঁছে ঐ অনুভব নিজে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে আস্বাদন করেছেন ; তাই ভাষার এই আশ্চর্য শক্তি। প্রতিটি শব্দ যেন মন্ত্রময়, পড়তে গিয়ে দেহ মন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ; মনে পড়ে যায় ভগবদ্গীতার শেষে "কৃষ্ণার্জুন সংবাদের" বর্ণনা করতে গিয়ে স্তম্ভিত, অভিভূত সঞ্জয়ের মুখে ব্যবহৃত দুটি আশ্চর্য বিশেষণ : "অদ্ভুতং রোমহর্ষণম্"।

অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রগতির সঙ্গে এইভাবে সাধক ক্রমশঃ উচ্চ হতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হন। সত্যের তারতম্যের এ হল একটা দিক্। আর একটা দিক হচ্ছে : খণ্ড সত্য ও পূর্ণ সত্য। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়াকে তিনি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করেছেন ; "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"য় একজন প্রতীচ্য বিজ্ঞানীর গ্রন্থ হতে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, মূল ইংরাজি ভাষায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন, সত্য হলেও এ খণ্ড সত্য, পূর্ণ সত্যের একাংশ মাত্র। পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয়েছিল এই ভারতবর্ষে, দিব্যদর্শী ঋষিদের ধ্যান চেতনায়। ব্রহ্মবিদ্যা হচ্ছে সেই অখণ্ড, পূর্ণ সত্য, যার মধ্যে অন্য সমস্ত অপরা বিদ্যা নিঃশেষে বিধৃত।

এই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হয়েছে বেদান্তে ; তাই তাঁর দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা"য় (তিন খণ্ডে প্রকাশিত) ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন "ব্রহ্মসূত্র" বা "বেদান্ত দর্শন"কে। তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য দর্শন প্রণেতা ঋষিগণ ভ্রান্ত ; সন্তদাসজীর

মতে তাঁরা প্রত্যেকেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য আপ্ত পুরুষ ; তবে শিষ্যের অধিকার ও ধারণাশক্তির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন নি, একাঙ্গের মাত্র উপদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁদের জ্ঞানের ন্যূনতা নয়, অন্তর্দৃষ্টির গভীরতাই প্রতিপন্ন হয়। কাজেই তাঁদের উপদিষ্ট বিদ্যা পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার অংশ মাত্র হলেও সম্পূর্ণ সত্য। (এমন কি একথাও তিনি বলেছেন, জৈন ও বৌদ্ধ মতেও সত্য নিহিত আছে।)

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মর্তব্য। সন্তদাসজী বারংবার বলেছেন, খণ্ড সত্য আশ্রয় করেও অবশেষে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়; পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে সাধককে যে গোড়া থেকেই সেই অখণ্ড সত্যকেই অবলম্বন করে অগ্রসর হতে হবে তার কোন মানে নেই। সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সম্যক্ অনুধাবন করতে হলে একথাটা সর্বদা মনে রাখতে হবে। শাস্ত্রপ্রবক্তা আচার্যবৃন্দের সন্তদাসজী মহারাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় এবং এই সমন্বয়-ভাবনার মূলে রয়েছে এই সহজ তত্ত্বটি : সত্যের একাংশ মাত্র আশ্রয় করেও অন্তিমে পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্যে পৌঁছান যায়। (কথাটা আমাদের সহজ বোধ বা Common sense দিয়েও বোঝা শক্ত নয় ; দুরূহ তত্ত্বকে প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ করে, সাধারণের বোধগম্য করে বোঝাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ)।

সাংখ্য দর্শন বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধ নয়, অন্তর্ভূত : কারণ, অংশের সঙ্গে সমগ্রের বিরোধ হতে পারে না। আর চরম উপলব্ধির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও পার্থক্য নেই, সাংখ্যের "কৈবল্য"ও

যা বেদান্তের "মুক্তি"ও তাই, কারণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা (যা সাংখ্য বা জ্ঞান মার্গাবলম্বীর চরম লক্ষ্য) আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার একই কথা, "আত্মা"কে জানলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকেও জানা হয়—একথা সন্তদাসজী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন। ভগবান ও গীতায় ঠিক এই কথাই বলেছেন। অথচ কথাটা অনেকেই স্বীকার করতে চান না ; এঁদের মতে সাংখ্য বা পাতঞ্জলের কৈবল্য খুব উচ্চ অবস্থা হলেও শেষ অবস্থা নয়, এর চেয়েও উচ্চ অবস্থা আছে। সন্তদাসজী কিন্তু একথা কখনো বলেন নি ; তাঁর মতে একথা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং স্পষ্ট গীতা-বাক্যের বিরোধী।

পূর্বেই বলেছি, ষড়্দর্শনের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন বেদান্তদর্শনের, কারণ শ্রুতি প্রতিপাদ্য সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যাই বেদান্তে উপদিষ্ট হয়েছে। অতএব সর্বোচ্চ অধিকারীর জন্যই বেদান্ত। "সর্বোচ্চ অধিকারী"র অর্থ, যিনি খণ্ড সত্য নয়, পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বকেই সাধনার প্রারম্ভ থেকেই অবলম্বন করতে সমর্থ। বলা বাহুল্য এরূপ ধারণাশক্তির অধিকারী অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সর্বোচ্চ অধিকারীর জন্যই বেদান্তের সাধনা, আর বেদান্তের সাধনা হচ্ছে ভক্তিযোগ। বেদান্তদর্শনের ভূমিকায় (এই অপূর্ব ভূমিকাটি বৈদান্তিক সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ ; মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় তিনি বেদান্তের সার মর্ম উদ্ঘাটিত করেছেন।) তিনি লিখেছেন "ভক্তিই এই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণ সাধনা।" কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন, এতই আশ্চর্য। যতদূর জানি বর্তমান ভারতের সাধক ও পণ্ডিত সমাজে একথা আর কেউ বলেন নি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত

নির্বিশেষে অধিকাংশ লোকেরই ধারণা, বেদান্তদর্শন একটা অত্যন্ত খটমট, ভীতিপ্রদ, সাংঘাতিক ব্যাপার। সন্তদাসজী এটা ভালভাবেই জানতেন। "বেদান্তদর্শনে"র ৬৮৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন "বেদান্তদর্শনের নাম শুনিলেই সাধারণতঃ লোকে অতি শুষ্ক কঠোর পদার্থ, কেবল নীরস তার্কিকদিগের উপযোগী বস্তু বলিয়া মনে করে। ইহা পাঠে যে মনুষ্যের বিশেষ কিছু উপকার হয় তদ্বিষয়ে ধারণা এক প্রকার লুপ্তপ্রায়।" এর কারণ সাধারণ লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও ধারণা, বেদান্তদর্শন মানে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ ; "ব্রহ্মসূত্র" বলে যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছে, যার রচয়িতা শঙ্করাচার্য নন, ভগবান বাদরায়ণ (বা বেদব্যাস) এ ধারনাই লুপ্তপ্রায়। সন্তদাসজীর দৃষ্টিতে শুষ্ক নীরস কঠোর তো নয়ই বরং সরসতায় ভরপুর, কারণ ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য যিনি, সেই ব্রহ্ম স্বয়ং রসস্বরূপ। আর ভক্তিমার্গের সাধনা হচ্ছে সেই রসস্বরূপের আরাধনা : "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। কাজেই ভক্তিমার্গের সাধনা আদ্যন্ত সরস ; সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গীর সাধনা শুষ্ক, নীরস।

কিন্তু এই ভক্তিমার্গের সাধনা বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি ঠিক তা তিনি বলেন নি, এটা মনে রাখা দরকার। প্রচলিত অর্থে ভক্তিযোগ হচ্ছে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। সন্তদাসজী একথা স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনের ভূমিকায় লিখেছেন : এই ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সগুণ উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে।....ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়েই। (পৃঃ ৪৩-৪৪) এটা একটা নতুন কথা, বৈষ্ণবোচিতও হয় ত নয়,

অনেকের কাছে। কথাটা হচ্ছে এই যে ভক্তিযোগের লক্ষ্য পূর্ণব্রহ্ম ; তা যদি হয় তা হলে ভক্তের কাছে ব্রহ্ম একাধারে মূর্ত ও অমূর্ত, সর্বময় অথচ সর্বাতীত, ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান্ আবার নির্গুণ নির্বিশেষে নিরবচ্ছিন্ন অক্ষর।

সাংখ্যমার্গীয় অস্তিমে এই পূর্ণব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হবেন নিশ্চয়ই ; তা হলেও তিনি সর্বোত্তম অধিকারী নন, কারণ পূর্ণ চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের দুটি পাদের (জগৎপাদ ও জীবপাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ) প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ; আর দুটি পাদ (ঈশ্বর পাদ ও অক্ষর পাদ) তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত। প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান কি করে হতে পারে। কারণ ব্রহ্ম তো তাঁর লক্ষ্য, চরম গন্তব্য নন তাঁর লক্ষ্য তো আত্মা। এর উত্তরে সন্তদাসজী বলেছেন, হাঁ, তা সত্য ; কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎভাবে তাঁর লক্ষ্য না হলেও, ভক্তের মতই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞই হবেন, কারণ আত্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। ব্রহ্মকে জানলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন আত্মস্বরূপও সাধকের কাছে প্রকাশিত হয়, তেমনি আত্মস্বরূপের জ্ঞান হলে আত্মারও যিনি আশ্রয় সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ আপনা হতেই সাধকের কাছে প্রকাশিত হয়—এই কথাই তিনি বলেছেন।

এবার পাতঞ্জল দর্শন সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলতে চাই। সন্তদাস স্বামীজী ছিলেন ভক্তিমার্গাবলম্বী বৈষ্ণব সাধক ; আর পাতঞ্জল দর্শন পরিপূর্ণভাবে সাংখ্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, যে কারণে এই দর্শন "সাংখ্য-পরিশিষ্ট" নামেও পরিচিত। কাজেই পাতঞ্জল যোগসূত্রকে তিনি প্রামাণিক ও ঋষিপ্রণীত বলে স্বীকার করলেও

খুব উচ্চ স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবেন, এটা মনে করাই স্বাভাবিক। অথচ ব্যাসভাষ্যসমেত এই পাতঞ্জল দর্শন সম্যক্ আয়ত্ত করতে না পারলে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনা বোঝাই যাবে না— এত বড় কথা তিনি বলে গেছেন। স্বকৃত পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভূমিকায় (তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের ভূমিকার মত এই ভূমিকাটিও পরম উপাদেয়) তিনি লিখেছেন: "এই পাতঞ্জল দর্শন সম্যক্ আয়ত্ত হইলে, ভারতীয় সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্রে ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের উপদিষ্ট সাধন প্রণালী-বিষয়ে চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়।....এই গ্রন্থ সাধকমাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপাদেয়।" আর ব্যাসভাষ্য সম্বন্ধে "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"য় (পৃ ৩০) লিখেছেন: "এই ভাষ্য স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হওয়াতে ইহা মূল গ্রন্থের ন্যায় আদরণীয়।....ইহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিলে অধিকাংশ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্মসকল সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।" তাঁর জনৈক প্রিয় শিষ্যকে একদা বলেছিলেন, এই গ্রন্থ সাধকের পক্ষে দর্পণ স্বরূপ। তাঁর নিজের সাধন জীবনে এই গ্রন্থের প্রভাব কতখানি গভীর ছিল তার একটি প্রমাণ তাঁর সাধনার প্রায় শেষ পর্যায়ের ডায়ারি। (এই ডায়ারি যা শ্রীশ্রীধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ কৃত তাঁর জীবন-চরিতে উদ্ধৃত হয়েছে, সাধক-মাত্রেরই পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ, পড়লে বোঝা যায় অধ্যাত্ম-সাধনাকে উপনিষদ্ কেন "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলে বর্ণনা করেছেন।) এই আশ্চর্য দিনলিপিটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে পাতঞ্জল যোগসূত্র তাঁর অধ্যাত্ম ভাবনার কতখানি জুড়ে ছিল তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। নিজের অবলম্বনীয়

পথ" বলে তিনি যে সাধন-ক্রমের উল্লেখ করেছেন তা এইরূপ— "শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা-অসম্প্রজ্ঞাত – পরমাত্মসাক্ষাৎকার।" এই ক্রমটি যোগসূত্রের একটি বিখ্যাত সূত্রে ("শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধি-প্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্") উল্লিখিত হয়েছে। (যদিও শেষ দুটি— অসম্প্রজ্ঞাত ও পরমাত্মসাক্ষাৎকার ঐ সূত্রে উল্লিখিত হয় নি)।

এর থেকেই বোঝা যাবে সীমাহীন, অপার অতলস্পর্শ মহা-সমুদ্রের তুল্য দুরবগাহ এই মহাপুরুষকে একজন typical ভক্ত বৈষ্ণব-সাধকমাত্ররূপে বর্ণনা করলে সবটা বলা হয় না, অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়। বাস্তবিক, এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় তাঁর অধ্যাত্ম-ভাবনা ও সাধনার ধারা কত গভীর, কত ব্যাপক ছিল; কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করে তাঁকে এবং তাঁর সাধনাকে বুঝতে যাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাধারণ জীবের পক্ষে মূঢ়তা মাত্র।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মভাবনায় তাঁর সব চেয়ে বড় দান—আর্য-শাস্ত্রের আপাতবিরোধী নানা ভাবধারার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন এবং এই শাস্ত্র সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের অভ্রান্তত্ব-প্রতিপাদন। সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে বিরোধ যে অসম্যগ্-দর্শিতা ও ভ্রান্তি-প্রসূত তা তিনি কি ভাবে প্রমাণিত করেছেন তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি। এই আশ্চর্য সমগ্র দৃষ্টির আর একটি দৃষ্টান্ত এবার উল্লেখ করব।

অসাধারণ ধীশক্তি, মনীষা ও অধ্যাত্ম-প্রতিভার (উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় যেমন প্রতিভার প্রয়োজন,

অধ্যাত্ম-জগতেও সিদ্ধিলাভ তদ্রূপ প্রতিভা-সাপেক্ষ; এবং এটাই হল সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিভা।) অধিকারী হয়েও এই মহাপুরুষ মুহূর্তের জন্যও তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা বা উপলব্ধিতে মৌলিকত্বের দাবী করেন নি। অধ্যাত্ম-জগতের সমস্ত তত্ত্বই সর্বদর্শী ঋষিরা আবিষ্কার করে গেছেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত; সুতরাং নূতন কথা আর তিনি কি বলবেন—এই ছিল তাঁর মনোভাব, একথা পূর্বেই বলেছি। (অবশ্য শাস্ত্রকর্তা ঋষিগণ সকলেই যে সর্বজ্ঞ, পূর্ণদর্শী ছিলেন, এ কথা তিনি বলেন নি; বলেছেন, তাঁরা সকলেই অভ্রান্ত ছিলেন, অর্থাৎ যাঁর কাছে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি ঠিক ততটাই বলে গেছেন; "অভ্রান্ত" হলেই যে তিনি "সর্বজ্ঞ" হবেন তার কোন মানে নেই; একমাত্র পূর্ণব্রহ্মবিৎ পুরুষই সর্বজ্ঞ হতে পারেন। এর থেকেই বোঝা যাবে "ব্রহ্মবিৎ" হওয়া কি ভীষণ ব্যাপার! "গুরু-শিষ্য সংবাদে" (পৃ ২১৬) "জীবিত কালেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন" এরূপ পুরুষের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: '"ইঁহাদের সংখ্যা যুগে যুগেই অতি অল্প জানিবে।") "আমি বলছি"—এ কথা তিনি প্রায় কখনো বলেন নি, বলেছেন, ঋষিরা এই বলে গেছেন; শাস্ত্র-প্রমাণ ছাড়া প্রায়শঃ কিছু বলতেন না—এই ছিল তাঁর সাধারণ রীতি। অথচ শাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে এমন অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যা আর্ষ দৃষ্টিতে নবাবিষ্কৃত সত্যের মতই আশ্চর্য।

যথা ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকায় (এই উপক্রমণিকাটি গীতার ভূমিকা বা introduction হিসাবে অতুলনীয়; এত অল্প কথায়

এত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি যেভাবে গীতার সারমর্ম উদ্‌ঘাটিত করেছেন, পড়লে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।) অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ সংখ্যক শ্লোকটির ("ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি") তাৎপর্য ব্যাখ্যা। শংকরাচার্য থেকে আরম্ভ করে গীতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ সকলেই ঐ "ব্রহ্মভূত" পদের "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ করেছেন পরব্রহ্ম। অথচ ঠিক তার পরবর্তী শ্লোকেই ভগবান্ বলছেন—ঐ "ব্রহ্মভূত" অবস্থা লাভ করলে সাধক তার পরেই "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" অর্থাৎ আমার (পর ব্রহ্মের) প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: "ব্রহ্মভূতঃ" পদের ব্রহ্ম যদি "পরব্রহ্ম"ই হন তা হলে এই "আমি" কে? পরব্রহ্মকেই যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়েছেন তাঁর আবার কার প্রতি ভক্তি হবে? তা হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই "আমি"ই সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম, যাঁর প্রতি ঐ ব্রহ্মভূত-অবস্থা-প্রাপ্ত সাধকের পরাভক্তি সঞ্চারিত হয়। তা যদি হয় তা হলে ঐ "ব্রহ্মভূতঃ" পদের লক্ষ্যীকৃত "ব্রহ্ম" কে? আশ্চর্য এই যে এ প্রশ্নের মীমাংসা কোন ভাষ্যকারই করতে পারেন নি। একমাত্র সন্তদাসজী মহারাজই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন; তিনি বলেছেন, "ব্রহ্মভূতঃ" পদে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম নন, "কার্যব্রহ্ম" বা "হিরণ্যগর্ভ" ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশিত মূর্তরূপ, বিশ্বাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় পুরুষ (এঁকেই সাংখ্যে বলা হয়েছে "মহত্তত্ত্ব", এবং পুরাণে "মহাবিরাট্")। বাস্তবিক এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে না; একমাত্র এই ব্যাখ্যাতেই গীতা-বাক্যের সমন্বয় হয়।

এটাই সব নয়। ঐ ব্রহ্মভূত (হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে একীভূত) অবস্থায় সাধকের অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সন্তদাসজী বলছেন এই অনুভূতি হল—পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে উল্লিখিত "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি"—অর্থাৎ "সত্ত্বগুণ বা বুদ্ধি হতে পুরুষ (আত্মা) পৃথক্, এই বোধ (খ্যাতি)।" এ একটা সম্পূর্ণ নূতন কথা। কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে এ জিনিষ হয় না, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ছাড়া। সাংখ্য ও বেদান্তের (ভগবদ্গীতা বেদান্ত-গ্রন্থ, এটা স্মরণ রাখতে হবে)। চিন্তাধারার মধ্যে এ ধরণের প্রতিষঙ্গ বা correspondence আবিষ্কার, কত বড় প্রাতিভ সংবিৎএর অধিকারী তিনি ছিলেন তার একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

আর একটি দৃষ্টান্ত। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের ৩৫ সংখ্যক সূত্রের ব্যাসভাষ্যের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, ব্যাসভাষ্যে উল্লিখিত "পৌরুষের প্রত্যয়ে" (অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা যে অবস্থায়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, নিজেই নিজেকে দর্শন করছেন বা জানছেন, জ্ঞাতাই যেখানে জ্ঞেয়, দ্রষ্টাই দৃশ্য) "সংযম" (ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি—এই তিনটিকে একত্রে "সংযম" বলা হয়; এটি যোগসূত্রে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ)। আর "পরাভক্তি"—একই কথা, অর্থাৎ এই "পৌরুষের প্রত্যয়ে"র বৈদান্তিক প্রতিরূপ বা counter-part হচ্ছে "পরাভক্তি"—উভয় একই অবস্থার দ্যোতক। কত বড় দ্রষ্টা তিনি ছিলেন তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই ধরণের অভাবিতপূর্ণ প্রতিষঙ্গ বা correspondence আবিষ্কার। শুধু এই একটি দিক্ থেকে বিচার করলেও এই মহাপুরুষ প্রজ্ঞানেত্র ঋষিদের সঙ্গে সর্বতোভাবে তুলনীয়।

এই ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্মর্ষি-কৃপা-পূত অধ্যাত্ম জীবনের একটি আশ্চর্য ব্যাপারের প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি এবার আকর্ষণ করতে চাই। ব্যাপারটা শুধু আশ্চর্য নয়, অলৌকিক। এটা হচ্ছে এই। আধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক মাত্রেরই, এমন কি উচ্চ কোটির সাধকগণেরও, প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে তারতম্য দৃষ্ট হয়। এটাই স্বাভাবিক। সন্তদাসজীর ক্ষেত্রে কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সকলেই জানেন, "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" রচনাকালে সন্তদাসজী ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী ; তখন তিনি সাধক এবং গৃহী। সাধক ও পণ্ডিত সমাজের পরম আদরনীয় ঐ গ্রন্থটিতে আর্যশাস্ত্রের সার মর্ম, ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম-ভাবনার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক বিধৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তখনও তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন নি, করেছিলেন বহু বৎসর পরে। অথচ এই গ্রন্থে তিনি যা যা লিখেছেন পরবর্তী কালে, সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ মনোরথ হওয়ার পরে ঠিক তাই বলে গেছেন, কিছুমাত্র পরিবর্তন কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না ; পূর্বে গৃহস্থ-সাধক অবস্থায়, যা লিখেছিলেন, তার একটি শব্দও সংশোধন বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তার একটি মস্ত বড় প্রমাণ হচ্ছে—তাঁর পূর্ণজ্ঞান লাভের পর প্রণীত গ্রন্থগুলিতে তিনি কখনো কখনো পূর্ব-রচিত কোন গ্রন্থ হতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। যথা : "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" ও "দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত" সিদ্ধি লাভের পরে রচিত এই দুটি গ্রন্থে "বেদান্ত দর্শন" (যা বহু পূর্বে রচিত "ব্রহ্মবাদি ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"র অন্তর্গত "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যর"র শেষ খণ্ড) থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা

যায় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল।

সাধকের জীবনে এরূপ পরিপূর্ণ পূর্বাপর অবিরোধ (consistency) সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যে জিনিসটার কথা বলতে চাইছি তা শুধু consistency নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি, এবং ঢের বেশি বিস্ময়কর। ব্যাপারটা এ নয় যে সাধক অবস্থায় পূর্ণতত্ত্বের কিছু কিছু অংশ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, বাকিটা প্রকাশিত হয়েছিল সিদ্ধিলাভের পরে; এটা মনে রাখতে হবে যে "গুরু-শিষ্য-সংবাদে"র মত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"তেও পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হয়েছে, পার্থক্য কেবল ভাষার।

পৃথিবীর অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে এ ব্যাপার সম্ভবতঃ অভূতপূর্ব; শুধু বিস্ময়কর নয়, অলৌকিক। ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও কয়েকজন নিঃসংশয় হতে পারেন নি; না পারাটাই স্বাভাবিক। এটা তিনি নিজেও জানতেন, তাঁর গৃহস্থ অবস্থায় প্রণীত গ্রন্থগুলির অভ্রান্তত্ব বিষয়ে কোন কোন শিষ্য সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। একবার তাঁর জনৈক প্রিয় শিষ্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত, সলজ্জ ও বিনীতভাবে তাঁর দীর্ঘকালের এই সংশয় নিবেদন করলেন। সন্তদাস স্বামীজী শুয়ে ছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন সোজা হয়ে। তাঁর পূর্বাশ্রমে রচিত একটি গ্রন্থ (সম্ভবতঃ "বেদান্ত-দর্শন") কাছেই ছিল, সেটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে অত্যন্ত স্নিগ্ধ, প্রসন্নভাবে বললেন, "বাবা! এর প্রতিটি word inspired হয়ে লেখা, বিশ্বাস কর।"

এ প্রসঙ্গে ঐ একটি কথাই বলতেন, অত্যন্ত সংক্ষেপে, আর্দ্র-স্বরে, "বাবার বরে লেখা"। এর মূলে যে তাঁর ব্রহ্মর্ষি গুরুদেবের অসাধারণ করুণা এবং প্রেরণা এ কথা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"র ভূমিকায় তিনি প্রকাশ করেছেন অপূর্ব মর্মস্পর্শী ভাষায়ঃ "তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ আমি মহৎকৃপা লাভ করিয়াছি; সেই কৃপাবলে অতি দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র সকলও স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহাদের গোপনে রক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে স্থানে বিস্মিত হইয়াছি।"

"ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" এবং তিন খণ্ডে প্রকাশিত "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" পাঠ করলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে কত বড় অসামান্য মেধাবী, কত বড় অসাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন গ্রন্থকার। কিন্তু এ সব দিয়েও এই আশ্চর্য পূর্বাপর সঙ্গতি এবং পূর্ণতত্ত্বদৃষ্টি ব্যাখ্যাত হয় না। বাস্তবিক গুরুকৃপা ছাড়া এই অলৌকিক ঘটনার কোন ব্যাখ্যাই হতে পারে না।

সন্তদাসজীর জীবনে এই গুরুকৃপার রহস্য অতি গভীর, সাধারণ বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি; এ থেকে বোঝা যাবে তাঁর "মহৎকৃপা" সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত বাক্য কতটা যথার্থ। ঘটনাটি তাঁর প্রিয় শিষ্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশিশির কুমার ব্রহ্মচারী মহাশয়ের রচিত "সন্তবাণী" নামক পুস্তিকা হতে গৃহীত।

শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রমে একদিন সন্তদাসজীর গুরুভ্রাতা প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস এসেছেন। সারদা বাবু সে সময় বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করে আকৃষ্ট হয়েছেন। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও তিনি শাঙ্কর ভাষ্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে প্রবৃত্ত। সন্তদাসজী অনেক বোঝালেন শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে (কোন তত্ত্ব বোঝাবার সময় তিনি শাস্ত্রোক্তির সঙ্গে যুক্তিও সংযুক্ত করতেন প্রায়ই—এটা শিশিরদা আমাকে অনেক ঘটনার প্রসঙ্গেই বলেছেন); সবই নিষ্ফল হল। তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও সারদাবাবু তাঁর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারছেন না। সন্তদাসজী তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় আরাম কেদারায় বসেছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, গম্ভীর স্বরে, "সারদাবাবু, ঘরে চলুন।" তারপর ঘরে ঢুকে যা বললেন তার সার মর্ম এই। এক সময় সন্তদাসজী (তখন অবশ্য তিনি তারাকিশোর চৌধুরী) মহত্তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ অনেক চিন্তা করেও পরিষ্কার ভাবে ধারণায় আনতে পারলেন না; সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তারপর পূজার ছুটিতে বৃন্দাবন গেছেন। আশ্রমে পৌঁছে গুরুদেব শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন, "আরে উস্‌মে ক্যা হ্যায়! মহত্তত্ত্ব তো য়হী হ্যায়।" সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। সন্তদাসজীর ভাষায়, "বায়োস্কোপের ছবির মত মহত্তত্ত্বের স্বরূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।"

একটি কথা পাঠকবৃন্দকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে এই: সন্তদাসজী কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে

কখনো একটি লাইনও লেখেন নি ; তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দের একমাত্র উদ্দেশ্য, উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে "বিবিদিষা" উৎপাদন করা। একথাটা সর্বদা স্মর্তব্য যে জিজ্ঞাসু এবং মুমুক্ষু পাঠকের জন্যই এই পরমকারুণিক আচার্যপ্রবর তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করেছিলেন। "বেদান্ত দর্শনের" উপসংহারে ভগবান্ বেদব্যাসের "ব্রহ্মসূত্র" প্রণয়ণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলে-ছিলেন তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য : "বেদান্তদর্শনে যে ব্রহ্মস্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জীবের পাপ-তাপ মোচনের নিমিত্ত এবং জিজ্ঞাসু সাধককে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার স্বীয় পাণ্ডিত্য জগতে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নহে। সর্বাশ্রয় সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মই যে জীবের গন্তব্য, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তিনিই যে জীবের পাপতাপহারী এবং আনন্দ-দাতা, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া, জীব যাহাতে আপনার সুগতির নিমিত্ত তাঁহার শরণাপন্ন হয়, এবং সর্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ভজন ও চিন্তনে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করাই পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে, দর্শনশাস্ত্র পাঠে কেবল তার্কিকতারই পুষ্টিসাধন হয়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না।"

("বেদান্ত দর্শন"—পৃঃ ৬২৫)

*   *   *   *

শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত গ্রন্থে সন্তদাসজী (তারাকিশোর চৌধুরী) দেখিয়েছেন তাঁর ব্রহ্মর্ষি-প্রতিম গুরুদেব কি ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। দীক্ষার পূর্বে দীর্ঘদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেও তারাকিশোর চৌধুরীর মত কুশাগ্রধী পুরুষও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকে সাধারণ মূর্খ, বিষয়ী গ্রাম্য বৃদ্ধ বলেই সাব্যস্ত করেছিলেন, তার পূর্বে কিছু কিছু অলৌকিক ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেও। সন্তদাসজী নিজেকে প্রচ্ছন্ন করেছিলেন আরো বেশি, তবে সেটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কি ভাবে সেটা বলছি।

কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ নিজেকে গোপন করেছিলেন মূর্খবৎ বালকবৎ হয়ে; সন্তদাসজী নিজেকে আবৃত করেছিলেন পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে। কথাটা হঠাৎ শুনলে হয়ত মনে হবে হেঁয়ালি (paradox), তাই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কথাটা হচ্ছে এই পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মূর্খতা ও বালকোচিত আচরণের মতই—কিংবা আরো বেশি – আত্মজ্ঞ পুরুষের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে প্রাকৃতদৃষ্টিতে। কারণ, সাধারণ লোকের কাছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রধান (হয়ত একমাত্র) মানদণ্ড—অলৌকিকত্ব আরও বস্তুটা মূর্খতার মধ্যে যদিও বা কিঞ্চিৎ বর্তমান থাকে, বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যের মধ্যে একেবারেই নেই! কোন পুরুষের কথাবার্তা ও আচরণ যদি অনায়াসেই বোধগম্য হয়, তা হলে আমাদের রহস্যানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত হয় না। আর রহস্যই যদি না থাকে তা হলে আর মহাপুরুষত্ব কিসের?

মুশ্‌কিল হয়েছে এই, সন্তদাসজী যদি কখনো ভুলেও একবার বলতেন এ সব তত্ত্ব তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করে বলছেন, তা হলেও কিছুটা চমৎকৃত হওয়া যেতো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি ও ধার দিয়েই যেতেন না; কথায় কথায় বলতেন, শাস্ত্রে এই আছে, ঋষিরা এই বলে গেছেন। এরূপ পুরুষকে শাস্ত্রবিৎ বলে, পণ্ডিত বলে সম্মান করা যায়, অবতার বা মহাপুরুষ বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অসম্ভব!

আর একটা কথা। কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে কোন কোন বিশেষ কৃপাভাজন শিষ্যের কাছে কখনো কখনো কিছু কিছু অলৌকিক যোগৈশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন; তাঁর জীবনচরিতে এরকম বহু আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ আছে (এবং এমন অনেক ঘটনাও ছিল যা এতই অবিশ্বাস্য যে তারাকিশোর তা প্রকাশ করেন নি)।

এ দিক্ থেকে শিষ্য ছিলেন গুরুর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের "অপরিসীম" শক্তিমত্তার কথা গুরু-শিষ্য-সংবাদে বারংবার বলেছেন, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্বেও সাধকের কি বিস্ময়কর যোগবিভূতির প্রকাশ হতে পারে তার একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এ কথা পূর্বেই বলেছি। অথচ নিজের জীবনে সে তুলনায় প্রায় কিছুই প্রকাশ করেন নি। শুধু তাই নয়, অলৌকিকত্বের প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়শঃই এড়িয়ে যেতেন, কিংবা বলতেন—ও সব কিছু নয়।

মুক্ত পুরুষের আচরণ "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ"—এ ধারণাটা বহুল প্রচলিত; শাস্ত্রেও এর সমর্থন কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে, নানাপ্রকার অস্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা তাঁরা

আত্মগোপন করে থাকেন ; এবং শাস্ত্রবিধিও তাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে লঙ্ঘন করে থাকেন ; তাঁরা শাস্ত্রবিধির অধীন নন এ কথা শাস্ত্রই বলেছেন। সন্তদাসজী কিন্তু নিজেকে প্রচ্ছন্ন, সাধারণ বুদ্ধির দুরধিগম্য করে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে ; তাঁর আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, কথাবার্তা ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য দিক্ থেকে যেমন, এ দিক্ থেকেও তিনি ছিলেন নিখিল শাস্ত্রের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি ; তাঁর সমগ্র জীবন ভগবদ্গীতার একটি অপূর্ব ভাষ্য। তাঁর সিদ্ধিলাভের পরবর্তী জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাহ্য-ব্যবহারে তিনি গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। শ্লোকটি হল :—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥"৩।২৬

তাঁরই নিজের কৃত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করছি : "কর্মাসক্তচিত্ত পুরুষগণের বুদ্ধিতে সংশয় উৎপাদন করিবে না (বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান বিদ্বান্ পুরুষগণ না করিলে সেই সকল কর্ম করণীয় কিনা, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ পুরুষগণের সংশয় উপজাত হইতে পারে ; অতএব কর্ম না করিয়া এইরূপ সংশয়ের হেতুভূত হইবে না)। বিদ্বান্ পুরুষ অনাসক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম স্বয়ং আচরণ করতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কর্মে সংযোজিত করিবেন।"

একটা কথা তিনি প্রায়ই বলতেন, শুনেছি : "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ হওয়ার অর্থ natural man (সহজ, স্বাভাবিক মানুষ) হওয়া।" একবার তাঁর জনৈক শিষ্যকে একটি পত্রে আশ্বাস দিয়েছিলেন :

"দেহান্তে তোমার উচ্চগতি অবধারিতই আছে।" শিষ্যের মনে কথাটার প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র-আনন্দদায়ক হয় নি, কারণ বাক্যের আরম্ভে "দেহান্তে" শব্দটা ছিল। একদিন সন্তদাসজীর শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরেই শিষ্যটি শ্লেষ-মিশ্রিত স্বগতোক্তি করলেন, "মরে গিয়ে দারোগা হব।" বুদ্ধিমান্ শিষ্য জানতেন তাঁর গুরুদেব তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান্, অতএব ইঙ্গিতটা বুঝতে তাঁর দেরি হবে না। হলও তাই। সন্তদাসজী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েই এক প্রচণ্ড ধমক: "আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে কি বোঝ বল ত? চতুর্ভুজ হতে চাও?"

আর এক দিনের ঘটনা। শিবপুর আশ্রম। জনৈক শিষ্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে—সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সন্তদাসজীকে বলা হল; সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, বিচার হবে। হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীব ছিলেন, কাজেই সাড়ম্বরে বিচার-সভা আহূত এবং আয়োজিত হল। বিচার আরম্ভ হল। অভিযুক্ত শিষ্যকে বিচারকোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সর্বসমক্ষে প্রশ্ন করলেন, "এ সব অভিযোগ, যা শুনছি, তা কি সত্য?" দুর্জয় অভিমান ও দারুণ ক্ষোভের সঙ্গে নিরপরাধ আসামী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তার আগে আপনি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি বলুন আপনি সব দেখছেন কি না? যদি সাক্ষী সাবুদ ডেকেই আপনাকে বিচার করতে হয় তা হলে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করবার তো কোন দরকার ছিল না আমার, আগেই বেশ ভাল ছিলাম।" সন্তদাসজী এবার নিজেই শিষ্যের কাছে

অভিযুক্ত ! কিছুক্ষণ নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তারপর সস্নেহে শিষ্যের পিঠে হাত দিয়ে শান্ত, দয়ার্দ্র স্বরে বললেন, "বাবা ! দেখছি তো বটেই। কিন্তু তোমরা এ সব সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে অলৌকিকত্ব আশা করতে যাও কেন বল তো ? তা ছাড়া, তোমাকে তো আমি অভিযুক্ত করি নি, শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, অভিযোগ সত্য কি না। "হাঁ" কি "না" বললেই তো সব মিটে যায়।"

সন্তদাসজী এক জায়গায় লিখেছেন, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যে তৃতীয় দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হয় বলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে, তা সম্পূর্ণ সত্য, এবং এ কথাও সত্য যে চর্মচক্ষু ব্যবহার না করেও তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে সব কিছুই দেখতে পান। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে তাঁরা স্থূলচক্ষুরিন্দ্রিয় প্রয়োগ করেন না ; তাঁরা আমাদের মতই চোখ দিয়ে দেখেন। এই ঘটনাটির ক্ষেত্রে কথাটা স্মরণীয়।

আর সন্তদাসজী যাঁকে natural man বলেছেন, ভগবদ্গীতায় তাঁকেই বলা হয়েছে "গুণাতীত" পুরুষ। গুণাতীত পুরুষ বলতে কি বোঝায় সেটা তাঁর জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনায় সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ঘটনাটি সন্তদাসজী মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "সুদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চমৎকার প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে ; লেখিকা শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী, সন্তদাসজীর কন্যা প্রতিম বিদুষী শিষ্যা। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই। একদিন রাত্রে শিবপুর আশ্রমে লেখিকা অনবধানতাবশতঃ বারান্দায় আলোটি নিভিয়ে দিতে ভুলে যান। সন্তদাসজী সেটা লক্ষ্য করলেন। তারপর গঙ্গাদেবীকে

দেখেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন, শেষে বললেন সামনে থেকে সরে যেতে, কারণ মুখ থেকে ফস্ করে কিছু বেরিয়ে গেলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে! গঙ্গাদেবী তো স্তম্ভিত; এই তুচ্ছ অপরাধের প্রতিক্রিয়া যে এখন ভয়ানক হতে পারে স্বভাবতঃই এটা তাঁর ধারণাতীত। দারুণ দুঃখ হল; সেই সঙ্গে দুর্জয় অভিমান। উদ্গত অশ্রু সংবরণ করে নীরবে অন্য ঘরে চলে গেলেন। বুক ফেটে কান্না এল। কিছুক্ষণ পরে সন্তদাসজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কাছে এসে বসতেই রুদ্ধ অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠল। সন্তদাসজী শুয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে পরম শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন: "দুর্বল শরীর পেয়ে তমোগুণ মস্তিষ্ককে আক্রমণ করেছিল, তাইতে ক্রোধ হল। তা আমার তো কিছুই নিরোধ করবার দরকার হয় না, আমি তো কেবল দ্রষ্টারমত দেখে যাই।"

সন্তদাস স্বামী কোন্ স্তরের পুরুষ ছিলেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে এই একটি ঘটনায়। আর ঐ আশ্চর্য কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় গীতার বর্ণিত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ: "প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥১৪/১২ অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষের মধ্যে শুধু সত্ত্বগুণ (প্রকাশ) নয়, রজোগুণ (প্রবৃত্তি) ও তমোগুণ (মোহ) ও সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত দ্রষ্টামাত্র—"উদাসীনবদাসীনঃ" — উদাসীনের মত সব দেখে যান মাত্র। তাঁর কাছে তমোগুণও ব্রহ্মশক্তিরই লীলা, তিনি আর দ্বেষ করবেন কাকে, নিরোধই বা করতে যাবেন কেন? গুণাশ্রয়

ব্রহ্ম যাঁর কাছে সর্বদা সর্বত্র প্রকাশমান, তিনি কাকেই বা হেয় বলে প্রত্যাখ্যান করবেন; কাকেই বা উপাদেয় বলে গ্রহণ করবেন, তাঁর কাছে তো কেবল গুণাত্মক বলে কিছু নেই—সবই ব্রহ্মাত্মক—"সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

তাঁর সিদ্ধিলাভের পরবর্তী জীবন পর্যালোচনা করলে মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি যেন চেষ্টা করে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে সংবৃত করে রাখতেন, পাছে কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। একবার কোন অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটা হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। আজ তিনি যখন স্থূলদেহে নেই, কথাটা বলতে বাধা নেই। ব্যাপারটা ঘটেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। লোকে লোকারণ্য; সন্তদাসজী দাঁড়িয়ে আছেন দর্শনাভিলাষী অগণিত নরনারীর অবিশ্রান্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ কিছুটা যেন উদাস, আত্মগত ভাবে বলে উঠলেন: "কিছুই তো প্রকাশ পেল না, প্রকাশ পেলে ছিঁড়ে খেত।" তাঁর গুরুদেবও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ন রায়কে, এমনই ঈষৎ-বিষণ্ণ উদাস ভাবে।

কেন যে প্রকাশ করেননি তার একটা প্রধান কারণ, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন, যথার্থ বিশ্বাস ঐশ্বর্য দর্শন করিলেই হয় না। একবার দীক্ষাগ্রহণের কয়েক বৎসর পর আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং গুরুর প্রতি বিশ্বাস আশানুরূপ হচ্ছে না দেখে জনৈক শিষ্য নৈরাশ্যভারাক্রান্ত এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। চিঠির উত্তর এল—"পত্রপাঠ চলে এস!" শিষ্য যখন এসে উপস্থিত হলেন তিন শো মাইল দূর থেকে, বললেন পা টিপতে।

পাদসংবাহনরত দূরাগত শিষ্য ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, গুরুদেব মূল ব্যাপারটার বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করছেন না, চুপচাপ শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা। এটা ঘটেছিল তাঁর দীক্ষাগ্রহণের বহু বৎসর পরে, যার মধ্যে তাঁর যোগীশ্বর গুরুদেবের অলৌকিক যোগবিভূতি নানা অত্যাশ্বর্য, অবিশ্বাস্য ঘটনায় প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়েছেন। একদিন বৃন্দাবনে গুরুদেবের কাছে বসে আছেন, মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। কথাটা কি করে বলবেন তাই ভাবছেন। আর থাকতে পারলেন না, বললেন, তাঁর মনে হচ্ছে অন্য গুরু বরণ করতে হবে। কণ্ঠস্বরে গভীর নৈরাশ্য। কাছেই বসেছিলেন এক পশ্চিম দেশীয় সাধু গুরুভাই। তিনি বাংলা জানতেন না, তাই গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজী ক্যা বোল রহে হ্যাঁয় ?" উত্তরে কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে বললেন, "বাবুকা বুখার হুয়া, ইসীকে লিয়ে ওয়ে গড়বড় বোলতে হ্যাঁয়।" কথাটা বলতে বলতে সন্তদাসজীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল; একটু থেমে বললেন, "পাছে ঐ গুরুভাই কথাটা জানলে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা আসে সে জন্য বাবাজী মহারাজ সত্যটা সম্পূর্ণ গোপন করে গেলেন।" বলতে বলতে চোখমুখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

ঘটনাটি বলবার অভিপ্রায় হল—ঐশ্বর্য দেখলেও অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। আবার না দেখেও হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে চিত্তের নির্মলতার ওপর। একটি পত্রে ক্রমটি এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ চিত্ত শান্ত হলে অনুভূতি হয়, আর এই অনুভূতি

থেকেই আসে বিশ্বাস। যোগৈশ্বর্য-প্রদর্শন যে বিশ্বাস-উৎপাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, বিশ্বাস বস্তুটা যে বাহ্য-প্রমাণ-নিরপেক্ষ এবং চিত্তের অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এ কথাটা তাঁর পরবর্তী আচার্য শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাসজী মহারাজকে উদ্দেশ করে লেখা একটি পত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন, "কেবল সিদ্ধাই দেখাইয়া যে বিশ্বাস জন্মান তাহাতে নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়; এই জন্য ঋষিগণ তাহা নিষেধ করিয়াছেন।"

সাধনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কত সহজ এবং লক্ষ্যে চিত্ত দৃঢ় অবিচলিত রাখা সাধকের পক্ষে কত কঠিন তা তিনি জানতেন। তাই ভজনশীল শিষ্যদের মধ্যে জ্যোতিদর্শন, অনাহত-ধ্বনি-শ্রব ইত্যাদির বিবরণ পড়ে পত্রোত্তরে এ সব একদিকে যেমন যথার্থ এব শুভ-সূচক বলে উল্লেখ করেছেন, আর একদিকে তেমনি .বিশে গুরুত্ব ও দেননি; বলেছেন এসব "বাহিরের জিনিস"; এসব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানই ভাল। এই "বাহিরের জিনিস" কথাটা লক্ষণী কারণ তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার মূল হচ্ছে অন্তর্মুখীনতা, এব আধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রগতির প্রধান লক্ষণ বা criterion, জ্ঞানের প্রকাশ এবং আনন্দের অনুভূতি (গীতায় এই দুটিই সত্ত্বগুণের লক্ষণ বলে বর্ণিত হয়েছে-এটা লক্ষণীয়)। একটা কথা বারবার বলেছেন আসল কথা হল অহঙ্কার দূর হয়ে চিত্তের প্রসারণ হচ্ছে কি না দর্শনাদি বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, অনুভূতির (spiritual experience) আনুষঙ্গিক লক্ষণ বা symptom মাত্র, যা ঘটতে পারে আবার নাও ঘটতে পারে, সকলের পক্ষে সমান নয়; না ঘটলে

যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হল না—এ ধারনা ভুল। এই প্রসঙ্গে একবার চমৎকার উপমা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মনে কর একজন ট্রেনে কলকাতা থেকে বোম্বাই যাচ্ছে; সারাটা পথ জেগে থেকে জানালা দিয়ে নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে বোম্বাই পৌঁছল। ঐ ট্রেনেই চলেছে আর একজন, তারও গন্তব্য স্থল বোম্বাই। সে সারাটা পথ ঘুমিয়েই কাটাল, পথে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু লক্ষ্য স্থলে সেও ঠিক ই পৌঁছল, এবং ঠিক একই সময়ে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ও এই রীতি; কেউ দেখতে দেখতে গেল, কেউ আবার কিছুই দেখল না; দেখতেই যে হবে তার কোন মানে নেই, আর না দেখলেই যে সব ব্যর্থ হল তাও নয়, কারণ, "আত্মরূপে সর্বশেষ যে দর্শন তাহা চাক্ষুষ দর্শন নহে, তাহা আত্মজ্ঞান।"

তা ছাড়া সকলের অধিকারও সমান নয়। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের এইখানেই একটা পার্থক্য: অধিকারবাদ। "ব্রহ্মবাদী ঋষিও ব্রহ্মবিদ্যায়" এ কথাটা খুব পরিষ্কার করে বলেছেন। তাই উচ্চাঙ্গের সাধন, ধ্যান-ধারণা-সমাধি, সকলের জন্য নয়, এ কথাটা বারবার খুব জোর দিয়ে দিয়ে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি পত্রে লিখেছেন, "বর্তমান কালে জীব পাঁচ মিনিট কালও চিত্ত স্থির করতে সমর্থ হয় না। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কিরূপে এইরূপ চিত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে?" এই কারণেই সাধারণতঃ ঐ সব উচ্চাঙ্গের সাধন তিনি শিষ্যদের উপদেশ করতেন না। ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্মযোগ—তাঁর মতে কলিযুগের পক্ষে এই হচ্ছে সর্বসাধারণের অবলম্বনীয় প্রকৃষ্ট সাধন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি

হয়, আর তখনই যথার্থতঃ উচ্চাঙ্গে সাধন অবলম্বনে অধিকার জন্মায়। একবার কথোপকথনকালে বর্তমান যুগে সেবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একজনের কথার ভাবে বোঝা গেল এটাকে তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্নাঙ্গের সাধন বলে মনে করেন। সন্তদাসজী তাঁকে উদ্দেশ করে বেশ কঠোর স্বরে বললেন, "ভাবছ খুব করে জপধ্যান করবে, এই তো? পাগল হয়ে যাবে। পাঁচ মিনিট ঠিক ঠিক ভগবদ্ ধ্যান করলে যে শক্তি সঞ্চারিত হবে তা তোমার এই অপটু শরীর ধারণ করতেই পারবে না।"

একবার পায়চারি করতে করতে পার্শ্বস্থ জনৈক শিষ্যকে উদ্দেশ করে দুঃখ করে বলেছিলেন, "বাবা! ভগবান্‌কে কেউ চায় না চাইলে পাওয়া যায়।" কথাটা কত সহজ, অথচ কত গভীর! একটি নিদারুণ, মর্মান্তিক সত্য, তারপরেই একটি পরম আশ্বাস: "চাইলে পাওয়া যায়।"

এই "পাওয়া" অর্থে তিনি কি বলতে চেয়েছেন সেটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা দরকার, তা না হলে তাঁকে বোঝাই যাবে না। তার আগে একটা আশ্চর্য ঘটনা প্রাসঙ্গিকবোধে উল্লেখ করছি। ঘটনাটি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসজী মহারাজের কাছে শ্রবণ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল। ঘটনাটি এই। একদিন "ধ্রুবোপাখ্যান" পাঠ হচ্ছে। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। পাঠ সমাপ্ত হলে সন্তদাসজী মন্তব্য করলেন, "পাঁচ বৎসর বয়সে সিদ্ধিলাভ—সাধনার ইতিহাসে এটা একটা record।" কথাটা শুনে কৃষ্ণদাসজী মহারাজ বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু গুরুদেবের নিজেরই কৃত উক্তি

দ্বারা সমর্থিত এই প্রশংসাই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়া যেটা হল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সন্তদাসজী, প্রসন্ন হওয়া দূরের কথা, অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে ধমক দিয়ে উঠলেন, "কি, হয়েছে কি? বড় লোকের মত এলেন, বর দিলেন, চলে গেলেন! একে কি পাওয়া বলে?" কৃষ্ণদাসজী তো স্তম্ভিত; কি আর করেন, ক্ষুণ্ণমনে চুপ করে রইলেন। সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে সন্তদাসজী কৃষ্ণদাসজীকে উদ্দেশ করে শান্ত, গম্ভীর স্বরে বললেন, "আশা সর্বোচ্চ রাখবে।"

কি সেই সর্বোচ্চ আশা, কি সেই চরম "পাওয়া"? তার উত্তর দিয়েছেন শ্রুতি: "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা; আর ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। প্রশ্ন হতে পারে "জানা"র অর্থ "হওয়া" কি করে হয়, "জ্ঞা" ধাতু আর "ভূ" ধাতুর অর্থ তো সম্পূর্ণ আলাদা। উত্তরে সন্তদাসজী বলছেন, গীতার উপক্রমণিকায়,— এই "জানার" অর্থ বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, কারণ বুদ্ধি (বা জ্ঞান) সত্ত্বগুণাত্মক, আর "জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম গুণাতীত।" অতএব গীতায় ভগবান্ বলছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", অর্থাৎ এই পরব্রহ্মকে জানবার একমাত্র উপায় "পরাভক্তি"। বুদ্ধির অধিকার হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত; এই হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্মপ্রাপ্তিই হল জ্ঞানের "পরানিষ্ঠা" বা পর্যবসান ("নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা"); জ্ঞানসাধনার এইখানেই শেষ। এখন প্রশ্ন: "পরাভক্তি দিয়ে জানা"—এর অর্থ কি? ভক্তি দিয়েই যদি জানতে হয়, তা হলে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের তফাৎটা কোথায়? উত্তরে সন্তদাসজী বলছেন, এখানে জানার অর্থ তাই হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ

এই জানায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বলে কোন ভেদ থাকে না। অতএব শ্রুতি বলছেন : "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় : "জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম গুণাতীত। মনে রাখতে হবে, শব্দপ্রয়োগে তিনি অত্যন্ত সাবধান, অত্যন্ত particular ছিলেন ; "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার না করে তিনি যে "পরব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন, এর নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে, সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করতে হবে, পরাভক্তির লক্ষ্য (object) এই "পরব্রহ্ম"। এই "পরব্রহ্ম" কে ?

এর উত্তর দিয়েছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকায়, অত্যন্ত স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। "এই ঐশী শক্তি, ভোক্তা শক্তি এবং ভোগ্য শক্তির আশ্রয়রূপে যে পরম পুরুষ বর্তমান আছেন,—যে সদ্বস্তু ঐ ত্রিবিধ শক্তিময়, তিনি পরম অক্ষর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়েন।" (পৃ: ১৪) অর্থাৎ শ্রুতি যাঁকে "অক্ষর" বলেছেন, তিনিই এই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। এখানে লক্ষ্য করতে হবে এই "অক্ষর ব্রহ্ম"কে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের একটি পাদ মাত্র বলে বর্ণনা করলে ভুল হবে। কেন, তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন পূর্বোদ্ধৃত বাক্যটির কিছু পরেই। "পরন্তু প্রথমোক্ত অক্ষরপাদই অপর তিন পাদের আশ্রয়। তিন পাদ ঐ প্রথম পাদেরই ত্রিবিধ শক্তিময় অবস্থা। ঐ ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয়রূপে এক "সৎ" পদার্থই প্রথম পাদে বর্ণিত হইয়াছে।"

তা হলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মকে চতুষ্পাৎ বলে সন্তদাসজী যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি এ কথাও বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়, যে ঐ

'অক্ষর ব্রহ্ম'ই ব্রহ্মের 'মূল স্বরূপ', এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব বা ultimate reality। আর পরাভক্তির লক্ষ্য এই অক্ষর ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। গুরু-শিষ্য-সংবাদের ২৫৬ পৃষ্ঠায় ঠিক এই কথাই বলেছেন 'ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত রাজপথের' সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়: "এইরূপ করিয়া পরে সম্পূর্ণরূপে নির্মলচিত্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হইয়া অক্ষরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবে...।" অতএব এই অক্ষর-ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই সেই চরম 'পাওয়া' যাকে শ্রুতি বলেছেন 'পরম মোক্ষ' গীতায় বলেছেন 'ব্রহ্মনির্বাণ'। এই পাওয়ার কথাই সন্তদাসজী বলেছিলেন, যখন ধ্রুবোপাখ্যান পাঠের পর শিষ্যকে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, 'একে কি পাওয়া বলে?'

তাঁর গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলে দেখা যাবে, ব্রহ্মস্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সর্বত্র ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত বলেছেন, শক্তিকে স্বীকার না করলে উপাসনাই হয় না, কারণ তা হলে ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের কোন যোগই থাকে না; এই শক্তিকে অবলম্বন করেই সব কিছু। শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ মূলতঃ এই নিয়ে; কারণ, শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্ত-ভাষ্যে (যদিও সর্বত্র নয়) ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা বা ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছেন।

এখানে বেদান্তের ভাষ্যকার হিসাবে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ আচার্য শঙ্করের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় স্থানে স্থানে তিনি শাঙ্করিক মত খণ্ডন করেছেন এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখতে হবে শতকরা আশীভাগ (কিম্বা তারও বেশি) বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য-কৃত

ব্যাখ্যা নিম্বার্কভাষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নেই—একথা সন্তদাসজী বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; এবং তাঁর শেষ গ্রন্থ "ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে" উভয়ের মধ্যে মূলগত বিরোধ যে সামান্যই এবং ঐক্যমত্যই যে বেশি, এটাই প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সন্তদাসজীর মতে—যেটা এইমাত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি—পরম তত্ত্ব (ultimate reality) এক, অখণ্ড, অদ্বৈত; "দ্বৈতাদ্বৈত" বা "ভেদাভেদ" শব্দটা বাস্তবিক তত্ত্ব বোধক নয় সম্বন্ধ দ্যোতক-ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধই ঐ শব্দে লক্ষ্যীকৃত। সন্তদাসজী বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের শাস্ত্র-সিদ্ধ অখণ্ডত্বের এবং অদ্বৈতত্বের হানি হয় না। আর ব্রহ্মস্বরূপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি "অদ্বৈত" শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন—এটা লক্ষণীয়। প্রমাণস্বরূপ তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত তিনটি গ্রন্থে প্রদত্ত ব্রহ্মের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি। ১। "ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সৎ-পদার্থে" ("বেদান্তদর্শন"—ভূমিকা)। ২। "ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সদ্বস্তু ("গুরু-শিষ্য-সংবাদ, পৃঃ ১৯১)। ৩। "শ্রুতি ব্রহ্মকে এক অদ্বৈত, নিত্য পূর্ণস্বভাব, এবং চতুষ্পাদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপক্রমণিকা, পৃঃ ৯)। বাস্তবিক তাঁর এই অদ্বৈতপরতা এবং আত্যন্তিক মোক্ষ-নিষ্ঠা তৎকালীন কোন কোন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবাচার্যের দৃষ্টিতে অশোভন এবং অবৈষ্ণবোচিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এমন কি, "গুরু-শিষ্য-সংবাদ" প্রকাশিত হওয়ার পর একজন বৈষ্ণবাচার্য রুষ্ট হয়ে গ্রন্থকারকে "শঙ্করমতাবলম্বী" বলে বিদ্রূপ পর্যন্ত করেছিলেন। কথাটা হাস্যকর হলেও যিনি বলেছিলেন তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঠিক অযথার্থও বলতে পারি না। বাস্তবিক, সন্তদাস স্বামীজীর অদ্বৈত-নিষ্ঠা, "মোক্ষ"কেই জীবের চরম লক্ষ্য এবং পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা, বিগ্রহোপাসনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব স্বীকার করা, ব্রহ্মের শ্রুত্যুক্ত "অক্ষর"পাদকে শুধু স্বীকার

করা নয়, অন্য তিনপাদের আশ্রয় এবং ব্রহ্মের মূল স্বরূপ বলে বর্ণনা, তত্ত্ববিচারে সর্বত্র শ্রুতি-বাক্যকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান এ সব চিন্তা করে দেখলে তাঁকে বেদান্তের কোন কোন বৈষ্ণব ভাষ্যকার আচার্যের চেয়ে শঙ্করাচার্যের ঢের বেশি কাছাকাছি বলে মনে হয়; কাজেই পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য যে তাঁকে ক্রুদ্ধ হয়ে শাঙ্করিকমতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী বলে উপহাস করেছিলেন এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু এখানে এসেই তিনি শেষ করেন নি। তারপর বলেছেন, ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব যেমন অবশ্য স্বীকার্য, তেমনি একথাও সত্য যে এমন অবস্থাও ব্রহ্মের আছে যেখানে শক্তিরও স্ফুরণ নেই। কোন কিছুরই স্ফুরণ নেই, সেখানে সব কিছু, চরাচর বিশ্ব একরস হয়ে আছে এক অখণ্ড, নির্বিশেষ, অদ্বৈত সত্তায়। এই অবস্থাই ছান্দোগ্য শ্রুতির লক্ষীকৃত সেই 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' এই চিদানন্দময় সৎ ই বিষ্ণুপুরাণের 'সত্তামাত্রম্', শ্রীমদ্ভাগবতের 'জ্ঞানমদ্বয়ম্', 'বস্তু দ্বিতীয়ম্' (অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বৈত বস্তু)। ইনিই সেই 'অক্ষর', 'পরমাত্মা', 'পরব্রহ্ম'। 'গুরু-শিষ্য-সংবাদে' এই সন্মাত্রে'র কথা বলতে গিয়ে সন্তদাসজী বলেছেন, 'বস্তুতঃ তাঁহার এই রূপ কোন প্রকারে নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে তিনি আছেন।" শিষ্য প্রশ্ন করলেন তিনি আছেন এ ছাড়া কি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই বলবার নেই? গুরু উত্তরে বললেন, হাঁ, কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া যায়। কি সেই আভাস শিষ্য জানতে চাইলেন। গুরু বললেন—শ্রুতি বলেছেন, 'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসঘন, আনন্দময়; আনন্দই তাঁর 'মূল স্বরূপ'।

(অন্যত্র এই সৎস্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই অবস্থাকে একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সাগরে মগ্নাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে (ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত) ।"

এই সর্বাশ্রয়, সর্বাতীত, নিরবচ্ছিন্ন চিদানন্দময় অদ্বৈত সত্তাই সাধকের অন্তিম লক্ষ্য, পরমাগতি। "অতএব যখন স্বীয় আশ্রয়স্থানীয় এই অদ্বিতীয় আনন্দময় সৎ-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন তিনিও আনন্দময় হইয়া যান। ইহাই তাঁহার মোক্ষাবস্থা।" (গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃ ৪২)। শ্রুতি বলেছেন, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' 'সেই রস-স্বরূপকে লাভ করে সাধক নিজেও আনন্দময় হয়ে যান।' আর শ্রুতি স্বয়ং যখন এ কথা বলেছেন, তখন সন্তদাসজী তো বলবেনই, কারণ তিনি যে স্বয়ং শ্রুতি বা বেদান্তের মূর্ত বিগ্রহ।

এই আনন্দই 'গুরু-শিষ্য-সংবাদে'র মূল সুর আদি-মধ্য-অন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যেমন এই বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই আনন্দময় সৎস্বরূপ। সেই অচ্যুত, অপরিসীম, অনির্বচনীয় আনন্দঘন সন্মাত্রে পৌঁছে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে, একমাত্র শ্রুতিই রয়েছেন সেই অনির্বচনীয়ের 'কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র' বহন করে, আর রয়েছেন সেই ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা যাঁরা সেই চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হয়ে সেই 'অচ্যুত' অপরিসীম আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে আস্বাদন করেছিলেন, এখনও করছেন, অনন্তকাল ধরে করবেন। সন্তদাসজী এঁদেরই একজন, যাঁদের সম্বন্ধে তাঁর প্রিয়তম গ্রন্থ, সেই অনির্বচনীয়ের বার্তাবহ উপনিষদ্ বলেছেন ;

"সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৫।১।৫)

"এই ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রাপ্ত হয়ে ঋষিরা হয়েছিলেন জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতার্থ, প্রশান্ত ও বীতরাগ। সেই ধীর প্রশান্ত পুরুষগণ সেই সর্ব-ব্যাপী বস্তুকে সর্বত্র প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হন।"

ওঁ তৎ সৎ

---

*হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক এই অংশ গুলি প্রধানতঃ "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" হতে উদ্ধৃত। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ভাবনার একটি পরিপূর্ণ, অখণ্ড চিত্র এই গ্রন্থে যে ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, শুধু বাংলা ভাষায় নয়, আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে তা তুলনাবিহীন। উদ্ধৃত অংশ থেকে মূল গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আভাস-মাত্র পাওয়া যাবে ; আলোচিত বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সন্তদাস স্বামীজী মহারাজ যা বলেছেন তার সারমর্ম :—

১। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত বস্তু, পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের সত্য নিহিত আছে, এ কথা সত্য। কিন্তু সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা এই ভারতবর্ষেই প্রকটিত হয়েছিল ; অদ্বৈত ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম নির্বাণরূপ মোক্ষের ধারণা (conception) অন্যত্র উপজাত হয় নি। এই ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার সারভূত এবং সার্বভৌম, অতএব মানব মাত্রেই এই বিদ্যায় অধিকার ; এই অর্থে হিন্দুধর্ম কোন বিশেষ জাতি বা দেশের ধর্ম নয়, বিশ্বমানবের সার্বভৌম ধর্ম।

২। হিন্দুধর্ম বলতে সচরাচর যা আমরা বুঝি, বা আমাদের বোঝান হয়, তা যথার্থ নয়। এ প্রসঙ্গে সাকার-বিগ্রহোপাসনার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অরূপ, অমূর্ত হলেও নিরাকারে মনঃ-সমাধান কত কঠিন, ঋষিরা তা জানতেন ; তাই মূর্তি-পূজার প্রবর্তন। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সম্যক্-ব্রহ্মবিদ্যা-ধারণে যাঁরা অসমর্থ (আমরা বেশির ভাগ মানুষই এই শ্রেণীর) তাঁদের প্রতি অপার করুণাই পুরাণ-বর্ণিত অর্চারাধারণার প্রবর্তক। এটা মনে রাখতে হবে, আরম্ভ মূর্তে হলেও শেষ অমূর্ত ; প্রতিমাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা হয়, ব্রহ্মে প্রতিমা বুদ্ধি নয়।

৩। অতএব অপেক্ষাকৃত মন্দাধিকারীর জন্যই সাকারোপসনা। এই অধিকারভেদবাদ হিন্দুধর্মের অন্যতম এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য ধর্মের নেই। অধিকারিভেদেই উপাসনার নানাত্ব সাধনার অনন্ত বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ভাবনার অনৈক্য নয়, সার্বভৌমত্ব ও পূর্ণত্বই সূচিত করে।

৪। "পত্রাবলী" থেকে উদ্ধৃত পত্রাংশটিতে হিন্দূধর্ম সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরাকৃত হয়েছে। হিন্দুধর্ম আচার-সর্বস্ব, এটা ভুল ধারণা; আচার হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র, অরন্তঙ্গ নয়; অবশ্য বহিরঙ্গ হলেও অপরিহার্য, কারণ সদাচার চিত্তশুদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৫। হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্যগুরু-বাদ। অন্যান্য অপরা বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা আচার্যের প্রয়োজনীয়তা নিঃসংশয় স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্বান্তকরণে স্বীকার করি, অথচ সর্ববিদ্যার মধ্যে সব চেয়ে গভীর ও দুরূহ ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গুরুর শরণাপন্ন হওয়া মূঢ়তা বলে উপহাস করাটা প্রাজ্ঞোচিত বলে মনে করি—এটা আশ্চর্য বোধ হয়।

এই গুরুতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়ে প্রবৃত্তিমার্গে এবং নিবৃত্তি-মার্গের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, তা সাধকমাত্রেরই গভীরভাবে অনুধেয়। নিবৃত্তি বা মোক্ষমার্গ যে সংসার সৃষ্টির বিপরীত মুখী, অর্থাৎ লয়াভিমুখী—এই রহস্যটি তিনি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

৬। আর একটি জিনিষের প্রতি তিনি বুদ্ধিবাদী অথচ শ্রদ্ধধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এঁদের মতে ব্রহ্ম-"দর্শন" কথাটা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র (nonsense) ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন,

এই চিন্তাই ব্রহ্মের দর্শন। সন্তদাসজী (তারাকিশোর চৌধুরী) বলেছেন, ন
তা নয়, বাস্তবিকই ব্রহ্মের দর্শন হয়। অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত আর সাক্ষা
অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এক জিনিষ নয়; দু'টোর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভে
বস্তুতঃ এইখানেই অন্যান্য বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনার তফাৎ
উপলব্ধিই (experience) হল অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা।

এই সকল বিষয়ে স্বামী সন্তদাসজী নিজ লিখিত উক্তি নিম্নে উদ্ধ
করা হল :—

হিন্দুধর্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা

........হিন্দুধর্ম বলিতে কেবল কতকগুলি আচার নিয়ম মাত্র বুঝা
না এবং ইহা কেবল কোন বিশেষ দেশবাসী বিশেষশ্রেণীর লোকে
ধর্ম নহে; ইহা সনাতন ধর্ম, মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে অধিকার আ
এবং মনুষ্য মাত্রকেই ইহার উপদেশ সকল বিষয় করে।* ইহ
সর্ববিধ মনুষ্যের সর্ববিধ প্রকৃতির উপযোগী ধর্ম। পরন্তু মানব প্রকৃ
অনন্ত প্রকার ভেদবিশিষ্ট, সুতরাং হিন্দুধর্মের উপদেশ সকল দেশ
কাল ও পাত্রভেদে অনন্ত প্রকারের হইয়াছে। আচার নিয়মে
উপদেশ ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে বহুল প্রকারের আছে সত্য; তাহ
অবশ্যম্ভাবী, কারণ ধর্মের উচ্চ উপদেশ সকল ধারণা করিবার জন্য
শরীর এবং মনের বিশেষ পবিত্রতার আবশ্যক; সেই পবিত্রত

---

* "মনুষ্য মাত্রকেই ইহার উপদেশ সকল বিষয় করে" অর্থাৎ এই ধর্মে
উপদেশ সমূহ মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে উপযোগী।

সম্পাদনের নিমিত্ত সাধারণ জীবের সর্ববিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ পূর্বক তত্তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত আচার নিয়ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে উচ্চ জ্ঞান-লাভের উপযোগী পবিত্রতা মনের ও শরীরের সম্বন্ধে আসিতে পারে না। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন "আচারহীনন্তু ন পুনন্তি বেদাঃ," অতএব তৎপ্রদর্শিত আচারকে হিন্দুগণ খুব মর্য্যাদা করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু আচার বিষয়ক উপদেশ সকলও ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে অতিশয় বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। পরন্তু এই সকল আচার মাত্রই হিন্দুধর্ম নহে; আচার নিয়ম যথার্থ হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গমাত্র, এই সকল প্রকৃত অন্তরঙ্গ ধর্ম সাধনের সহায়কারী মাত্র; অন্তরঙ্গ সাধনের সহিত যুক্ত থাকিলেই এই সকল উপকারী হয়, নতুবা অনেকস্থলে কুফল উৎপাদন করে। যেমন ধন সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে শুভকার্য্যের সাধক হয়; কুপাত্রের অধিকৃত হইলে তাহা কুকার্যেরই আনুকূল্য করে; ইহাও তদ্রূপ।

অন্তরঙ্গ সাধন বিষয়েও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ সকলের বহু পার্থক্য আছে। অন্তরঙ্গ, অন্তরঙ্গতর, অন্তরঙ্গতম প্রভৃতি বহু ভেদ থাকা ইহাতে দৃষ্ট হয়। সাধকগণ উত্তরোত্তর উর্দ্ধ ভূমি সকল যেমন লাভ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধনোপদেশ সকলও সদ্বিবেচক গুরু পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অপরাপর যে সকল প্রাচীন ধর্ম মনুষ্যলোকে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই কোনও না কোনও অন্তরঙ্গ সাধন

আদর্শ নিহিত আছে ; সুতরাং তৎসমস্তই প্রকৃত হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত অংশমাত্র ; কোনওটির সহিতই সনাতন সর্বব্যাপী হিন্দুধর্মের বিরোধ নাই। অপরাপর ধর্ম প্রবর্ত্তকগণও যাহা নিজে যথার্থ সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা সত্য বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন তাহাই জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঋষিদিগের উপদেশের সহিত তৎসমস্তের কোন বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত বস্তু। সকল দেশেই যেমন যেমন মনুষ্য প্রকৃতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনি তেমনি ঋষিদিগের উপদেশ সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভবের বিষয় হইতে থাকে ; ইহা কল্পনামাত্র নহে। সুতরাং সকল দেশে এবং সকল প্রাচীন ধর্মেই ঋষিবাক্যের অনুরূপ উপদেশ সকল দৃষ্ট হয়।

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৯-৯১)

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা

এই ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের পাদস্পর্শে ইহার ধূলিকণা সকল পবিত্র হইয়াছে। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ক জ্ঞান, জীবের স্বরূপ এবং সর্ববিধ দুঃখনিবৃত্তির হেতুভূত পরব্রহ্মতত্ত্ব (যাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে, তাহা) এই ভূমিতেই ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবাসিগণের বিশেষ বিদ্যা ; বর্তমান দুর্দশাপন্ন অবস্থায়ও ভারতবাসী হিন্দুগণই এই ব্রহ্মবিদ্যা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সন্তানগণের

বিশেষ অধিকার।....ভারতবাসী আর্য্যগণের প্রকৃতি স্বভাবতঃ পরমার্থ চিন্তনের অনুকূল; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা এই ভারতভূমিতে যদ্রূপ আলোচিত হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন স্থানে হয় নাই; অতএব এই ভূমিতেই এই বিদ্যা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরা পর দেশেও ধর্ম্মানুশীলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম জীবের স্বভাবগত বস্তু; সুতরাং ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল শ্রেণীর জীবেই কোন না কোন প্রকার ধর্মানুশীলন আছে। কিন্তু অপর সকল জাতিতে ধর্মাচরণের চরম ফল কোন না কোন প্রকার স্বর্গ লাভ মাত্র। কোন বিশেষ প্রকার স্বর্গাধিপতি-রূপেই 'ঈশ্বর' অপরাপর ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন এবং অপর দেশবাসী কর্তৃক পূজিত হয়েন। পরন্তু কেবল ভারতভূমিতেই পূর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে এবং অদ্বৈত ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তিরূপ মোক্ষই যে জীবের চরম আদর্শ তাহা কেবল ভারতভূমিতেই ঋষিগণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিদ্যা অন্যত্র তাই।

জগৎতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব নিঃশেষরূপে পরিজ্ঞানার্থে. ধ্যাননিমগ্ন ঋষিগণের নিকট অশরীর বাণীসকল আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে তদ্বিবিষয়ক তত্ত্বসকল প্রথমে উপদেশ করেন; সেই সকল আকাশ-বাণী 'শ্রুতি' নামে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। শ্রুতিমুখে তত্ত্বসকল অবগত হইয়া ঋষিগণ তদুপদিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক জগৎ কারণ পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! তাঁহারা তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত এই বিদ্যা অনুগত শিষ্যদিগকে তাঁহাদের অধিকার অনুসারে নানা প্রকারে "উপদেশ করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে

তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। ঋষিগণ সাধারণ জনসমাজের উপ-কারার্থে শ্রুতিবাক্য সকল অনুবাদ ও বিস্তার করিয়া ইতিহাস পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকলও রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ। তন্মধ্যে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত অধি-কাংশ পুরাণ ও ইতিহাস মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস কর্তৃক উপদি (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ২৭-২৯)।

........হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইলে এই পৃথিবী মণ্ডলে বিধাতার এক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকৌশল বিলুপ্ত হইয়া যায়। অপর সকল বিষ হীন হইয়া পড়িলেও ভারতবর্ষে হিন্দুজাতিতে সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রে অধ্যাত্ম বিদ্যা অদ্যাপি কোন কোন স্থলে এত অধিক পরিমা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া আছে, যে তাহার উপমা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুজাতির বিনাশে এতৎসমস্তই পৃথিবী হই লোপ প্রাপ্ত হইবে; ইহা বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া বিশ্ব করা যায় না। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা ১০ পৃষ্ঠা) তপস্যা ভি এই ভারতভূমিতে কখন কেহ স্থায়ী উন্নতি লাভ করে নাই তপস্যাদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে বিধাতৃপুরুষের প্রসন্নতা লাভ ক যায়; তিনি প্রসন্ন হইলে জীবের অপ্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না।

ধর্ম সাধনই ভারতবাসীর প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। এই দে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত যখন যিনি কোন মহৎ ক সম্পাদন করিয়াছেন, তখন তিনি ধর্মবলেই তাহা সম্পা করিয়াছেন, রাজনৈতিক ব্যাপার সকলও এই নিয়মের বহির্ভুত নহে বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন

শ্রীভগবদাবতার কৃষ্ণার্জ্জুনও স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়া বর লাভান্তে অভীপ্সিত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। মহারথী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণকে পরাভূত করা বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ জানিয়া অর্জ্জুন হিমালয় শিখরে সুমহৎ তপস্যা অবলম্বনপূর্বক দৈববল সঞ্চয় করতঃ যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং সমরে শত্রুদলকে পরাভূত করেন। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং দেবীর আরাধনা করিয়া বরলাভান্তে রাবণবধ করিতে অগ্রসর হয়েন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই প্রণালীই চিরপ্রচলিত; ইহার ফল এই যে, অপরের অসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিলেও তন্নিবন্ধন অহঙ্কার উপজাত হয় না; কারণ কর্মকর্তা জানেন যে, ইহা তাঁহার নিজ ক্ষমতায় সিদ্ধ হয় নাই। সামাজিক ব্যাপারে অনহঙ্কৃত চিত্তে বৈধ কর্ম করাই সুর ও আর্য্যভাব, ইহাই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আসুরিক ভাব অবলম্বনে এই দেশের ইষ্ট সাধিত হইবে না। আসুরিকভাবসম্পন্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাও বাঞ্ছনীয় নহে। যেমন দুর্বৃত্ত পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলে, সে তাহার নিজের ও প্রতিবাসীর অকল্যাণ সাধনের হেতু হয়। তদ্রূপ অসুরভাবাপন্ন অধর্মনিরত জাতিও স্বাধীনতা লাভ করিলে ইহা তাহার ও অপরের কল্যাণসাধনের হেতু না হইয়া বরং অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্মানুষ্ঠান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, চরিত্র নির্মল হয়, অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত হয়, তদ্বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রযত্ন করা এক্ষণে কর্তব্য। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ১৯-২১)

হিন্দুধর্মে অধিকারবাদ

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসার ও জিজ্ঞাসুব্যক্তির অধিকা ভেদে বক্তা ঋষিগণের উপদেশের পার্থক্য হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য বিষয়ে প্রভেদ হইলে যে, উপদেশের তারতম্য হইবে, তাহাও কিঞ্চিৎ অবধা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একই প্রশ্ন বালক ও প্রবীণ ব্যক্তি অন্তরে উদিত হইতে পারে এবং উভয়েই তদ্বিষয়ে আচার্যকে জিজ্ঞাস করিতে পারেন ; কিন্তু প্রশ্ন এক হইলেও সুবিজ্ঞ আচার্য কখন উভয়কে একই প্রকারে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন না ; কার বালকের ধারণাশক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তির ধারণাশক্তি সমান নহে সুতরাং যাঁহার যতটুকু ধারণা হইবে আচার্য্য তাঁহাকে ততটুকু উপদেশ করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ অধিকারীকে উত্তম, মধ্যম, অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; পরন্তু শিষ্যদিগে প্রকৃতি বিবেচনায়, প্রথমতঃ তাঁহারা কে কোন্ শাস্ত্রে অধিকারী তাহ নিরূপণ করিয়া, তৎপরে উত্তমাদি ভেদে তন্মধ্যে উপদেশের তারতম করিয়াছেন। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ১৪৬)

২

গুরু-শিষ্য-সংবাদ সন্তদাসজী মহারাজের সিদ্ধিলাভের পরবর্তীকালে প্রণী প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, "এই বই পড়ি ভজনের কাজ হবে।" শাস্ত্রে যে আপ্তবাক্যকে শাস্ত্রবাক্যের মতই শ্রদ্ধাই ব হয়েছে কেন তা এইগ্রন্থটি পাঠ করলে অনুভব করা যায়। আর বোঝা যা

পাণ্ডিত্য এবং উপলব্ধির মধ্যে কতটা তফাৎ। পড়িতে পড়িতে মনে হয় বিশ্ব-রহস্য যেন এক সর্বাবগাহী দৃষ্টির সম্মুখে নিঃশেষ অপাবৃত। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের দৃষ্টিতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব চরাচর কি ভাবে অবভাসিত হয় "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" রূপে এই জিনিষটাই এ গ্রন্থের অপূর্ব বস্তু, যার তুলনা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-সাহিত্যে দুর্লভ।

এই গ্রন্থ পাঠের যথার্থ অধিকারীও দুর্লভ, কারণ এতে উপদিষ্ট হয়েছে তাঁরই ভাষায়, "বেদান্তের গুহ্যতম সার"। উচ্চ ধারণাশক্তিসম্পন্ন মুমুক্ষু সাধকই এই গ্রন্থ পাঠের যথার্থ অধিকারী। প্রতিটি বাক্য যেন এক একটি মন্ত্র, এবং মন্ত্রের মতই তা শুধু শ্রোতব্য নয়, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য।

১। প্রথমোদ্ধৃত অংশটিতে ব্রহ্মস্বরূপ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে; বিস্তৃত আলোচনার জন্য মূল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অল্প কথায় কোন গভীর বিষয়ের সমগ্র তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁর কি অসাধারণ ছিল, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই উদ্ধৃতি।

২। বদ্ধাবস্থা ও মোক্ষাবস্থার স্বরূপ এভাবে আর কোথাও বর্ণিত হয়েছে বলে জানা নেই। অধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় রহস্যটি এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে আর্ষ দৃষ্টিতে।

একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করতে হবে। সন্তদাস স্বামীজী শঙ্করা-চার্যের মত "অবিদ্যা"কেই বলেছেন দুঃখের মূল; কিন্তু এই "অবিদ্যা"র অর্থ উভয়ের কাছে এক নয়। দৃশ্যমান জগৎ সত্য অর্থাৎ অস্তিত্বশীল বলে আমাদের যে দৃঢ়, স্বাভাবিক প্রতীতি, সন্তদাসজীর মতে তা ভ্রান্তি-প্রসূত নয়, যথার্থ; জগৎকে সত্তাশীল মনে করাটাই অবিদ্যা নয়, ব্রহ্ম হতে বিচ্ছিন্ন,পৃথগ্‌রূপে সত্তাশীল মনে করাটাই অবিদ্যা। মুক্ত পুরুষের কাছে জগৎ মায়াময় নয়, চিদানন্দময়।

৩। শক্রুর ও পাপত্মার প্রতি নির্বৈর হওয়া যায় কি করে এই প্রশ্নের উত্তরে সন্তদাসজী যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় সাধকের শেষ লক্ষ্য দ্বৈতবুদ্ধির বিলোপ এবং অদ্বৈতভাবনায় প্রতিষ্ঠা। পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।"—এই উপলব্ধি খুব উচ্চ অবস্থার উপলব্ধি বলেছেন, শেষ অবস্থা বলেন নি, ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্রারূঢ় ক্রীড়নক,—এই ভাবনার মধ্যেও দ্বৈতভাব কিঞ্চিৎ বিদ্যমান। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অনুভূতি আরো উচ্চ—সেখানে দ্বৈতের গন্ধমাত্র নেই।

৪। "জীবকে ঈশ্বর কেন পাপকার্যে নিযুক্ত করেন"—এই প্রশ্নের উত্তরে সন্তদাসজী বলেছেন, জগতে কোন কার্যই, এমন কি পাপকার্যও আকস্মিক নয়; বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তার মূলে রয়েছে অমোঘ বিধান, অনতিক্রমণীয় কার্য-কারণ-পরম্পরা। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘোর অন্যায় বলে প্রতিভাত হয়, তার দ্বারায় অন্তিমে বিশ্বের কল্যাণই সাধিত হয়, বিশ্বের (equilibrium) অক্ষুন্ন রাখার জন্য তার প্রয়োজন আছে। এ অনুভূতি যে আমাদের হয় না তার কারণ এই বিশাল সৃষ্টির এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্রে আমাদের সীমিত দৃষ্টি নিবদ্ধ, সমগ্র আমাদের দৃষ্টির অগোচর।

৫। শ্রীকৃষ্ণোপসনার তত্ত্ব হচ্ছে এই : সত্ত্ব গুণের মধ্য দিয়ে না গিয়ে (অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল না হলে) গুণাতীত বস্তু পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্ববিধ সাধনার, এমন কি জ্ঞানমার্গের সাধনার ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে লক্ষ্য এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়তা লাভ।

৬। "বিশ্বরূপদর্শন"ই ভগবদ্গীতার শেষ কথা, চরম প্রতিপাদ্য—এরকম একটা ধারণা বহুব্যাপ্ত। সন্তদাসজী কিন্তু একথা স্বীকার করেন নি, বরং এই

কথাই স্পষ্ট বলেছেন, ভগবানের প্রদর্শিত এই বিশ্বরূপ অপ্রাকৃত নয়, প্রকৃতির মধ্যেই। সর্বশেষ যে দর্শন, যা হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় কর্ম ক্ষীণ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় বলে শ্রুতি বর্ণনা করেছেন, তা চাক্ষুষ দর্শন নয়—অমূর্ত,অরূপ, চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার।

৭। মহাপুরুদের অবতারত্ব-নিরূপন প্রসঙ্গে সন্তদাসজী শিষ্যের সংশয় নিরাকরণ করতে গিয়ে যা বলেছেন তা অত্যন্ত কালোপযোগী। অবতার হলেই যে কোন পুরুষ অভ্রান্ত, পূর্ণতত্ত্বদর্শী হবেন, তার কোন মানে নেই। কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটলেই সর্বাগ্রে তাঁর অবতারত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য সাম্প্রতিক কালে যে তীব্র ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার একটা প্রধান কারণ, ব্রহ্মবিৎ পুরুষের যথার্থ মহিমা সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের নেই। তা ছাড়া উচ্চ সাধকদের অনেক সময় উপাস্যের সঙ্গে অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হলে নিজেদের অবতার বলে প্রতীতি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়—এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

হিন্দুধর্মে সম্প্রদায় ভেদ

.........অপ্রকাশ নিরাকার পরব্রহ্মোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্মল নহে। সাধারণত, সূক্ষ্ম পরমাণু অথবা বিস্তৃত আকাশ অতিক্রম করিয়া, তদতীত পরব্রহ্ম জীবের ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না; কোন প্রকার চিন্তা করিতে গেলেই, চিন্তা কোন না কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি-প্রজ্ঞা-যুক্ত ব্যক্তিই নিরাকার-ধ্যানে সমর্থ হইতে পারেন। পরমাত্মা অথবা আত্মা (পুরুষ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদেরও ধ্যানগম্য হয়েন না; কেবল যাহা কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎসমস্ত

হইতেই আত্মা অতীত জানিয়া জ্ঞানমার্গাবলম্বী যোগিগণ বুদ্ধিগম্য বস্তুজ্ঞান লয় করিয়া, আত্মস্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত, (আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত) প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপে সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তখন আত্মা প্রকাশিত হয়েন। পরাভক্তি-মার্গাবলম্বী যোগিগণের সাধন কিঞ্চিৎ অন্যরূপ হইলেও এতৎসম্বন্ধে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং সাধারণ জনগণ বিষ্ণু, শিব, বিরিঞ্চি, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা ইত্যাদি কোন না কোন প্রকাশরূপের ভজনেরই অধিকারী হয়। অতএব ভগবানের যে যে প্রকাশ মূর্ত্তিতে উপাস্যরূপে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া ঋষিগণ উপাসনার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং অপর সকলকে তত্তুলনায় সৃষ্ট ও অল্পশক্তিধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কেবল সাধকের উপাস্য বিষয়ে নিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত। এই উপাসনা করিতে করিতে, যখন চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর হয়, তখন স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া যায় এবং ঋষিদিগের বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য হয়।*

*ঈশ্বর বোধে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ অথবা শক্তির উপাসনা অপরাপর দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত আছে। যেমন কোন কোন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যীশুখৃষ্টকে ভগবান বলিয়া তাঁহার ও তাঁহার মাতা মেরীর মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। জারোষ্টার ধর্ম্মাবলম্বীগণ সূর্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করেন; বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনেকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আরাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসনা দ্বারা সকলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে উপাস্যের প্রকৃতি ও শক্তি ভেদে এবং উপাসনার গাঢ়তা ভেদে ফলেরতারতম্য হয় সন্দেহ নাই।

সুতরাং নানা সাধক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকা দেখিয়া, ঋষিদিগের মতদ্বৈধ কল্পনা করা উচিত নহে। পুরাণ সকল সমস্তই বেদব্যাস প্রণীত, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত ; অথচ এক এক শ্রেণীর পুরাণে এক এক প্রকার উপাসনারও এক এক উপাস্যদেবতার শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপাস্য আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ তাহাতে কোন বিরোধ নাই। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মাবিদ্যা পৃঃ ১৭৫-১৭৭)

ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার

জীবশক্তির অনন্ত ভেদ হেতু কোনও জীব এই ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ, কোন জীব সমর্থ নহে। যিনি এই বিদ্যা অবগত হইয়াছেন, তিনি অন্তরে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিতে যত্ন করেন যে, তিনি স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং সমস্ত জগৎ এবং অপর সমস্ত জীবও তদ্রূপই। এই ধ্যান দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে ; সুতরাং সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারে তিনি নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন, সংসারকে তিনি ক্রীড়া-ভূমিরূপেমাত্র দর্শন করিতে থাকেন ; তিনি এইরূপ জ্ঞান করেন যে, ব্রহ্ম জীবরূপ অবলম্বনে আপনি আপনাকে অনন্তরূপে দর্শন ও আস্বাদন করিতেছেন। বিচিত্র বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টিতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছুমাত্র নাই, তিনি নিজে লীলাময়, অনন্তরূপে নিজেই লীলা করিতেছেন মাত্র। এইরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির সহিত সাধকের চিত্ত হিংসা দ্বেষ ও মোহ-প্রভৃতি-বিবর্জ্জিত হইয়া সাগরবৎ গাম্ভীর্য্য

প্রাপ্ত হয় এবং নির্ব্বাত প্রদীপবৎ একাগ্রতালাভ করে; তৎপরে অবিদ্যা-জনিত সর্ব্ববিধ ভেদবুদ্ধি সম্যক্ বিনষ্ট হয় এবং সাধক স্বীয় ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্যার এইরূপই প্রভাব যে, যে সাধক এই বিদ্যা সম্যক্ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ আলস্য অনায়াসে দূর হইয়া যায়, তিনি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া, সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য স্বভাবতঃ সুমহৎ কষ্ট স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে একপ্রকার নিশ্চেষ্টতা বলিয়া যেন কেহ আপনাকে প্রতারিত না করেন।

সকল জীব এই বিদ্যা ধারণ করিবার যোগ্য নহে। অযোগ্য পুরুষ যদি এই বিদ্যা মৌখিক শিক্ষা করে, তবে কোন কোন স্থলে জন-সমাজে তাহার আলস্য এবং অপকর্ম্মের সমর্থনার্থ সে ইহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার চরিত্রই তাহার অসম-দর্শিত্ব প্রকাশ করিয়া, এই বিদ্যাধারণ বিষয়ে তাহার অক্ষমতা জন-সমাজকে জ্ঞাপন করিবে এবং যাহারা এই বিদ্যা ধারণা করিতে অসমর্থ তাহারা যদি ইহা কেবল মৌখিক শিক্ষা করে, তবে তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় কার্য্যকালে তাহারা ইহা বিস্মৃত হইয়া আপনার প্রবৃত্তির অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব এবংবিধ লোকের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নিষ্ফল ও অসঙ্গত বলিয়া ঋষিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল চিত্ত পুরুষেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার। যে প্রকৃতির পুরুষ যে প্রকার কর্ম্মচারণ করিলে ক্রমশঃ নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে, তাহা দিব্যদর্শী ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে

ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব অনলস চিত্তে বুদ্ধিপূর্ব্বক তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ২৩৫-২৩৬)

হিন্দুধর্মে সাকার উপাসনা ও অবতারবাদ

ভগবদবতারের মূর্ত্তিসকল অপর সাধারণ জনগণের উপাস্য হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বেদান্তমার্গ সম্যক্ অবলম্বন করিতে অসমর্থ, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ও তদতীত ব্রহ্মধ্যান যাঁহাদের বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, যাঁহারা ভেদবুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বত্র সমদর্শন স্থাপন করিতে অসমর্থ (সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই এইরূপ অবস্থাপন্ন), তাঁহাদের পক্ষে ভগবন্মূর্ত্তির পূজনই উৎকৃষ্ট ভক্তিমার্গের সাধন।

(ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ৩৫৭)

একান্তচিত্তে অবতাররূপী ভগবানের নাম স্মরণ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার গুণ ও কীর্ত্তিসকলের চিন্তনের দ্বারা জীব তন্ময়তা লাভ করে, সুতরাং সেই তন্ময়তা নিবন্ধন তাঁহার যে সর্ব্বময় ভাব তাহা আপনা হইতে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহারা সর্ব্বোত্তম অধিকারীর মধ্যে ভুক্ত হইয়া পড়েন। ইহাই ভারতীয় সাকার উপাসনা, ইহা ভগবদুপাসনা; ইহা পৌত্তলিকতা নহে; পরন্তু ইহা ভক্তিমার্গের অতি সহজ ও প্রকৃষ্ট সাধন। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ৩৫৯—৩৬১)

.... তিনি সর্ব্বগত, অতএব প্রতিমা তাঁহার পর নহে। যে ব্যক্তি তাঁহার ভজন করিতে ইচ্ছা করে, অথচ তাঁহার সর্ব্বগত ভাবের ধারণা

করিতে সমর্থ নহে, তাহার মঙ্গলের জন্য সীমাবদ্ধ প্রতিমা হইতেই আপনার শক্তি প্রকাশিত করেন। সমস্ত জগৎকে যে ব্যাক্তি ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে ধারণা করিতে অসমর্থ, সে যদি একটি পদার্থকেও ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাতে দোষের বিষয় কি আছে? প্রতিমারূপ সেই একটি বস্তুকে ত অন্ততঃ সে ব্যক্তি ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার এই ধারণাশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, তাহার মন আপনা হইতে প্রশস্ত হয় এবং সে ব্যক্তি পরে সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ধারণা করিতে সামর্থ্য লাভ করে; এবং সেই বিচক্ষণ সাধক অবশেষে সমগ্র বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া তদতীত পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। এইরূপে প্রতিমাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে প্রতিমারই ব্রহ্মত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়, পরন্তু তন্নিমিত্ত ব্রহ্মের প্রতিমাত্ব প্রাপ্তি হয় না। সূর্য্যাদি প্রতীকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতেই উপাসনার বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্র-কারগণ যে কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই প্রতিমাতে ব্রহ্মের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অঃ ২০শ শ্লোক

অস্যার্থ:— সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে যাবৎকাল

পর্য্যন্ত আপনার হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিতে না পারিবে* তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানব আপনার-আশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতীকাদিতে আমার উপাসনা করিবে।

অতএব ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না; বিশেষ বিশেষ প্রতিমা পূজাকেই তাঁহারা চরমধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। যিনি যেমন অধিকারী, তাঁহার জন্য তদ্রূপ উপসনারই ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ও অপর ধর্ম্মের মধ্যে এই একটি প্রভেদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অপরাপর ধর্ম্মে সকলের প্রতিই একপ্রকার উপদেশ। হিন্দুধর্ম্মে তদ্রূপ নহে। যিনি যেরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিতে যোগ্য, তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যগণ তদ্রূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এবং সেই উপদেশে নিষ্ঠাস্থাপনের নিমিত্ত অনেক স্থলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ করিয়া, তাহা গোপন করিয়া রাখিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। ইহা মিথ্যা ব্যবহার নহে; বস্তুতঃই যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার পক্ষে তদুপযুক্ত ধর্ম্মাচরণই সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার সম্বন্ধে অপর কোন উপদেশ তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ নহে।

.... ভারতবর্ষে এইরূপে সাধক সম্প্রদায়ভেদ উপদিষ্ট ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতাদিগের আরাধনাও এইরূপেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষিগণই এতৎসমস্তের

---

*আপনার হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মধ্যান, যাহা "দহর বিদ্যা" নামক ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীভূত তাহা এই স্থলে উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুতঃ উচ্চঅঙ্গের ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ই এই স্থলে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপদেষ্টা। ইহাতে তাঁহাদিগের কোনপ্রকার কুসংস্কার বা মতবিরোধ প্রকাশিত হয় না ; পরন্তু তদ্বারা তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা, উদারতা ও সর্ব্ববিধ জীবের প্রতি সহানুভূতিই প্রমাণিত হয় (ঐ পৃঃ ৩৬২-৩৬৬)

হিন্দুধর্ম্মে গুরুবাদ

... ... অপর সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেই গুরুকরণের প্রয়োজন হয় , অপরের কোন সাহায্য বিনা আপনা আপনি কেহ বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা অপর সকল বিদ্যা অপেক্ষা কঠিন এবং ইহাকে অপর সকল বিদ্যার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং এই শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গুরুকরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মনঃসংযম করিতে অভ্যাস করিতে করিতে, বুদ্ধিমান্ পুরুষ নানা বিধ অলৌকিক শক্তিও লাভ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন কোন স্থলে বিপদও ঘটিয়া থাকে। পরন্তু সাধারণ শক্তিলাভ বিষয়ে যেরূপই হউক, মোক্ষমার্গলাভ সদ্‌গুরু কৃপা ভিন্ন কখনই হইতে পারে না বলিয়া মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণীর সাধক, সর্ব্বকালে, একবাক্যে এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এই সংসারে দ্বিবিধ শক্তিস্রোত প্রবর্ত্তিত আছে ;একস্রোত প্রবৃত্তিমার্গ অপর স্রোত নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়। প্রবৃত্তি মার্গের স্রোত সংসারকে বর্দ্ধিত করে, নিবৃত্তিমার্গের স্রোত বহির্ম্মুখ জীবকে পুনরায় পরব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে

সংসারের বৃদ্ধি ; পুংস্ত্রী মিথুনভাব বৃক্ষলতাদিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহাই জগৎ সৃষ্টির সনাতন সাধারণ নিয়ম। যে সকল খাদ্যবস্তু পুরুষ আহার করেন, তাহাই স্ত্রীও আহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেই সকল খাদ্যবস্তু পুরুষদেহেই শুক্র উৎপাদন করে, স্ত্রীদেহে করে না। পুরুষদেহ হইতে স্ত্রী সেই বীজ গ্রহণ না করিয়া, নিজে আহার্য্য বস্তুমাত্র অবলম্বনে সেই বীজ প্রস্তুত করিয়া সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহাই সনাতন নিয়ম। এই নিয়ম ধারাবাহিক ক্রমে সৃষ্টি প্রকাশিত হইবার সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; এই নিয়মাধীন না হইলে, সংসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সর্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়াছেন যে নিবৃত্তি-মার্গ সম্বন্ধেও ইহার অনুরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। ভগবান যেমন জীবকে সৃষ্টি করিয়া, বৃদ্ধির জন্য তাহাকে মিথুনভাবে বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি-মার্গে প্রেরণা করিয়াছেন, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, শিষ্য পরম্পরায় মোক্ষধর্মের বীজশক্তিকেও ধারাবাহিকরূপে চালনা করতঃ সাংসারিক জীবকে অন্তর্ম্মুখ করিতে এবং অবশেষে মুক্তিপ্রদান করিতেও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে প্রবাহিত এই মোক্ষবীজ সদ্‌গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার যথাবিহিত সেবা করিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন অবতার রূপে জীব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন তিনিও এই সনাতন নিয়মের মর্য্যাদা সর্বদা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এক্ষণকার কালে কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়াই অনেকে ব্রহ্মদর্শন লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন। এইরূপ প্রযত্নও অশেষবিধ শুভ-

উৎপাদন করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের ইহা উপায় নহে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, এক্ষণে এইরূপই মত স্থাপিত হইতেছে যে, ভগবানের বাস্তবিক দর্শন লাভ করা সম্ভবপরই নহে, তিনি সর্বত্র আছেন বলিয়া চিন্তা করাই তাঁহার দর্শন। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে; ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, যথার্থই ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে এবং সেই দর্শন লাভ হইলে জীবের যে সকল অবস্থার স্ফুরণ হয়, তাহাও তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং অদ্যাপি ভারতবর্ষে ভগবদর্শন প্রাপ্ত পুরুষের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষগণ এই বিষয়টি সর্বদা স্মরণে রাখিবেন। (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা পৃঃ ৩৬৬-৩৬৮)

ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়

১) অনন্ত প্রকারে আপনাকে অনুভব করিবার শক্তি (চিৎ অথবা ঈক্ষণ শক্তি) সম্পন্ন এবং ২) অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্ট) হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট, যে ৩) ভূমা (অদ্বৈত, সর্বব্যাপী) আনন্দময় সদ্বস্তু তাহাই ব্রহ্ম। তত্ত্বসকল স্ফুরণের নিমিত্ত এই সংক্ষেপোক্তির কিঞ্চিৎ বিস্তার নিম্নে করিতেছি :—

ক) ব্রহ্ম আনন্দময় সদ্বস্তু, আনন্দই তাঁহার মূল স্বরূপ।

খ) পরন্তু এই আনন্দ চিৎশক্তিযুক্ত। এই চিৎশক্তি এই প্রকারের যে তদ্দারা আপন স্বরূপগত আনন্দকে তিনি অনন্তরূপে বিষয় করিতে পারেন ও নিত্য করিয়া থাকেন।

গ) ঐ আনন্দেরও অনন্তরূপে অনুভূত (দৃষ্টঃ জ্ঞাত) হইবার যোগ্যতা নিত্য বর্ত্তমান্ আছে এবং তাঁহার উক্ত চিচ্ছক্তির দ্বারা নিত্য অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হইতেছে।

ঘ) ঐ চিচ্ছক্তির দ্বারা এক ভেদরহিত আনন্দমাত্ররূপে ব্রহ্ম আপনাকে (১) যে অবস্থায় জ্ঞাত হইতেছেন, যাহাতে ঐ আনন্দের কোন বিশেষরূপে স্ফুরণ নাই, তদবস্থাকে ব্রহ্মের পর অমূর্ত্তরূপ বলা যায়। ইহাই অক্ষর ব্রহ্মরূপে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যত্র সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ তত্র কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এই অবস্থারই প্রকাশক। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

২) ঐ চিচ্ছক্তি দ্বারা ব্রহ্ম আপনার স্বরূপগত আনন্দকে যে অবস্থায় অনন্তরূপ বিশিষ্টরূপে সম্যক্ দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এই ঈশ্বরকে অপর অমূর্ত্তরূপ বলে। ইহাই ভূমা শ্রুতি প্রভৃতির লক্ষীকৃত অবস্থা ; এবং এই অবস্থায় ব্রহ্ম ভগবান্ ও বাসুদেব শব্দ বাচ্য।

৩) ঐ চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় আপন স্বরূপগত আনন্দের কেবল অনন্ত প্রকারের ভোগ্য অথবা ভোগ্য যোগ্যরূপে অনুভব (দর্শন) হয়, নিজ স্বরূপগত রূপে দর্শন হয় না, সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের মহাবিরাট্, অনন্তদেব, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি আখ্যা হয়; ইহাই তাঁহার তৃতীয় পরমূর্ত্ত অবস্থা। স্বরূপগত আনন্দের যে ভোগ্য-রূপে দর্শন ইহা হিরণ্যগর্ভের জাগ্রদবস্থা, আর ভোগ্যযোগ্যরূপে মাত্র যে অনুভব তাহা তাঁহার শয়নাবস্থা, যাহাকে প্রকৃতিলীনাবস্থাও

বলে। ঐ প্রকৃতি লীনাবস্থায় তাঁহার নাম কারণাব্ধি শায়ী নারায়ণ।

৪) ঐ চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে বিশেষ বিশেষ রূপবিশিষ্টরূপে এবং ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্যষ্টি-ভাবে (অসম্যকভাবে) দর্শন করেন, তখন তাহাকে জীব বলা যায়। যে অবস্থায় ঐ জীবের আপন চিন্ময়তার স্ফুরণ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তিনি বিশেষ দর্শনকারী চিন্ময় আনন্দরূপে বিরাজমান থাকেন, তখন তাঁহাকে বিমুক্ত জীব বলা যায়। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর সারূপ্য লাভ করেন, ঈশ্বর সম্যক্ দর্শনকর্ত্তা, তিনি ব্যষ্টি দর্শন-কর্ত্তা এইমাত্র প্রভেদ। যে অবস্থায় আপন চিন্ময়তায় স্ফুরণ থাকে না সুতরাং তখন অচেতন দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্টরূপে তিনি অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাকে বদ্ধজীব বলা যায়।

৫) ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ তাঁহার চিচ্ছক্তির যে অবস্থায় কেবল ভোগ্য অথবা ভোগ যোগ্যরূপে অনুভূত (জ্ঞাত, দৃষ্ট) হয়, তখন ইহার জগৎ ও অচেতন সংজ্ঞা হয়। ইহাকেই ব্রহ্মের প্রকাশ ভাব অথবা জগদ্রূপতা বলে।

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ যুগবৎ চতুষ্পাদবিশিষ্ট—(১) অচেতন জগৎ (২) ব্যষ্টি দ্রষ্টা (মুক্ত ও বদ্ধ) জীব (৩) (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) ঈশ্বর (৪) অক্ষর ব্রহ্ম। এই চতুষ্পাদকেই শ্রুতি সকল কখন বিভিন্ন করিয়া কখন একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রথমাধ্যায়ে ৭।৮।৯ বাক্যে এই চতুষ্পাদকে অতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ উপনিষৎখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে।

সহজভাষায় এতৎ সমস্ত বর্ণনার মিলিত ফল এই যে ব্রহ্ম

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ মাত্র, তাঁহার পূর্ণাঙ্গের এক এক পাদ; ঈশ্বর রূপী ব্রহ্ম এতদুভয়ের নিয়ন্তা, পরন্তু এতৎ সমস্তের নিয়ন্তা ঈশ্বর হইলেও তাঁহার বিভিন্নরূপ দর্শন বর্জ্জিত কেবল চিদানন্দময় নির্গুণাবস্থাও যুগপৎ বর্ত্তমান আছে।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইহা সহজেই বুঝিবে যে দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম. এবং তুমি (সাধক) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশমাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তদধীন। অতএব— (১) ব্রহ্মই তোমার আত্মা এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে তদধীন দাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, (২) সমস্ত জগৎ ও জাগতিক জীবকে ব্রহ্মেরই প্রকাশভাবমাত্র জানিয়া, সুতরাং সর্বত্র অদোষদর্শী হইয়া, (৩) ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে সকলের (পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র. ভৃত্য, দাস প্রভৃতি সকলের) যথাসম্ভব সেবায় নিযুক্ত হইয়া (৪) নির্লিপ্তভাবে কাল যাপন করিবে। এইরূপ করিয়া পরে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলচিত্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হইয়া অক্ষর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হইবে। ইহাই ব্রহ্মলাভের প্রশস্ত রাজপথস্বরূপ।

অথবা উপরোক্তভাব যথাসম্ভব স্মরণ রাখিয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব সকলের সর্ববিধ সাধারণ কল্যাণ সাধন এবং বিশেষতঃ মোক্ষা-নন্দ প্রদান করিবার জন্য ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ধ্যান, সদ্‌গুরুদত্ত তাঁহার নামজপ ও তদর্থে সমস্ত কর্ম্ম দাস-ভাবে সম্পাদন করিয়া তদগতচিত্তে যিনি কালযাপন করিবেন, তিনি অচিরে সমস্ত কল্যাণ লাভ করিয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন।

আর এই ভাবও যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি মোক্ষার্থী হইলে যদি ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হয়েন তবে তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিজে সাধনাদির ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার বর্জ্জন করিয়া অনলস ও নির্ল্লিপ্তভাবে কেবল তাঁহার আদেশ প্রতি-পালনীয় এই বুদ্ধিতে যদি আদিষ্ট কার্য্য করিতে কালযাপন করেন, তবে তাহাতেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি ও শান্তি লাভ করিবেন ।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ২৫৩-২৫৭)

বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা

ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, কোন বস্তুর চিন্তায় সুখ বোধ হইলে ঐ বস্তুর প্রতি অতিশয় আসক্তি উপজাত হয়, তাহাতে ঐ বস্তুর ধ্যান অতি দৃঢ়রূপে অন্তরে বসিতে থাকিলে জীব অবশেষে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যায়; তখন তাহার নিজ স্বরূপের স্ফুরণ আর থাকে না। আবার ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপের যে অংশটি প্রিয় সেই অংশটির প্রতিই মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হওয়াতে, সেই বস্তুর অপর অংশ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য বশতঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, স্ত্রীদেহের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা পুরুষের বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করে; কিন্তু ঐ স্ত্রী দেহটি মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালা, রক্ত প্রভৃতি দুর্গন্ধময় অপবিত্র বস্তুতে পূর্ণ আছে। কিন্তু স্ত্রী দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের মন এমন দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয় যে ঐ স্ত্রীদেহের অপবিত্র মলমূত্রাদি-বিশিষ্টতার জ্ঞান কার্য্যকালে তাহার

একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং অপবিত্র বস্তুপূর্ণ হইলেও ঐ স্ত্রীর সম্যক্ দেহই ঐ পুরুষের অতি প্রীতির বস্তু হয়। এই প্রকার ব্রহ্মের আনন্দাংশের প্রতি জীব স্বভাবতঃ অতিশয় আসক্তিযুক্ত হওয়ায়, এই আনন্দ যে চিন্ময় সদ্রূপ বস্তু, তাহা জীব একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় ; এবং ভোগ্য আনন্দাংশমাত্রের ধ্যানে, ঐ জীবের নিজেরও চিন্ময় সদ্রূপতার জ্ঞান অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতেই ভোগ্যবস্তুর অচেতন জ্ঞান উপজাত হয়, ঐ বস্তুকে জীব কেবল ভোগ্য বলিয়া বোধ করে এবং নিজেরও তাহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হয়। এইরূপে ভোগ্য বস্তুটির স্বরূপ জ্ঞান আবৃত হওয়ায় যে অংশটুকুর উপলব্ধি হয়, তাহা এক অলক্ষিত বস্তুর স্বরূপভুক্ত—এতাবন্মাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং ইহা সেই অলক্ষিত বস্তুর গুণ এইরূপ বোধ উপজাত হয়। ইহাই বদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপও বিস্মৃত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; নিজে ভোক্তা, এই মাত্র জ্ঞান তাহার নিজ সম্বন্ধে থাকে ; এবং ভোগ্য পদার্থে কেবল ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার সচেতন সদ্রূপত্ব আর লক্ষিত হয় না ; এক অলক্ষ্য বস্তু এই ভোগ্য পদার্থের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান আছে—এই মাত্র জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। পরন্তু জীব দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে যেমন অতি প্রিয় দেহও আর তদ্রূপ প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না, চৈতন্য সংযোগেই দেহের প্রিয়ত্ব হয়, তদভাবে হয় না, তদ্রূপ ভোগ্য বস্তুর চৈতন্য ময়তা—বিষয়ক বুদ্ধির বিলোপ ঘটিলে তাহার আনন্দময়তার অনুভবও ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন সেই অচেতন ভাবপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তুও আর তদ্রূপ আনন্দদান করিতে সমর্থ হয় না।

অতএব সেই হারান আনন্দলাভের আশায় জীব সংসারান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু ঐ আনন্দলাভের আশায় জীব যে রূপটিকে গ্রহণ করে, তাহা তাহার পূর্ণানন্দজনক নহে দেখিয়া স্বভাবতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাও তাহার পূর্ণানন্দদায়ক নহে দেখিয়া অপর রূপের প্রতি ধাবিত হয়। এইরূপ কালশক্তির অধীন হইয়া নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

জীবের এই বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা উভয়ই ব্রহ্মের ব্যষ্টিদর্শনের অন্তর্গত। জগতের প্রত্যেক রূপই যে ব্রহ্ম সত্তায় নিত্য অবস্থিত আছে তাহা এক্ষণে অবশ্য বুঝিয়াছ। এই সকল রূপকে ব্রহ্ম জীবরূপে পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করেন। ইহার নামই জগতের প্রকাশ। এই দর্শনও দ্বিবিধ; ঐ বিশেষ রূপটির মাত্র দর্শন একপ্রকার, আর ঐ বিশেষ বিশেষ রূপকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূতরূপে দর্শন (ঐ গুণময় রূপ সকলের আশ্রয়ীভূত চিন্ময় ব্রহ্মেরও দর্শন) দ্বিতীয় প্রকার। অপার সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তদপেক্ষা বৃহৎ, বৃহত্তর, এইরূপ বরফখণ্ড সকল ভাসমান থাকে। মনে করিয়া লও যে ঐ বরফখণ্ডেও জীব শক্তি বর্ত্তমান আছে; বস্তুতঃ কোন বস্তুই একান্ত জড় নহে, চিৎ ও জড় মিশ্রিত, অতএব এই কল্পনায় কোন দোষ নাই, বরফেও দৃক্‌শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। বরফরূপ দেহের আবরণে আবৃত থাকায় ঐ জীব বরফকে অতিক্রম করিয়া আশ্রয়স্থানীয় সমুদ্র জলকে দেখিতে পায় না। তোমার দৃষ্টিশক্তি তাহার দৃষ্টিশক্তি হইতে ব্যাপক। অতএব তুমি দেখিতে পাও যে বরফ সমুদ্রজলেরই অংশ এবং সমুদ্রজলেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি বরফস্থ জীবের দৃষ্টিশক্তি এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয় (অর্থাৎ তাহার দূর দর্শনের বাধা সকল এমন ভাবে দূর হইয়া যায়) যে, সে বরফের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তদাশ্রয়ীভূত সমুদ্রজলকেও তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারে, তবে তোমার ন্যায় সেও বরফকে এবং তাহার অঙ্গীভূত অংশ সকলকে সমুদ্রেরই অঙ্গীভূত-রূপে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বরফরূপ অঙ্গ তদবস্থায়ও তাহার বর্ত্তমান থাকায়, বরফরূপ দেহধারীরূপে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্যও থাকিয়া যাইবে। পরন্তু সূর্য্যের উত্তাপে ঐ বরফখণ্ড গ্রীষ্মকালে দ্রব হইয়া গেলে ঐ বরফ আপার সমুদ্রজলের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং তন্নিষ্ঠ জীবের সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে স্থিতির জ্ঞান সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সমুদ্র হইতে তাহার কোন প্রকারে পার্থক্য বুদ্ধি অথবা ব্যবহার বর্ত্তমান থাকে না ; সমুদ্রজল স্থির থাকিলে, সেও জলরূপে থাকিয়া স্থির থাকে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইলে সেও তরঙ্গায়িত হয়।

ব্রহ্মে স্থিত বিভিন্নরূপ সকলকে সমুদ্র জলস্থ বরফখণ্ড স্থানীয় জানিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত বরফের দৃষ্টান্তস্থলে বরফরূপ দেহধারী জীবের কেবল বরফমাত্রের যে জ্ঞান তাহাই বদ্ধজীবের জ্ঞানস্থানীয় ; আর দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ঐ বরফ সমুদ্রেরই অঙ্গীভূত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়; আর বরফ গলিয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হইলে যে জ্ঞান, তাহাই বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞানস্থানীয়। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানে বরফকে সমুদ্রের সহিত এক বলিয়াই জানা যায়। প্রথম প্রকারের জ্ঞানে বরফকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। আর তৃতীয়াবস্থায় বরফাবস্থা একেবারেই তিরোহিত হয়। তদ্রূপ জাগতিক প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধীয় যে ভেদজ্ঞান তাহা বদ্ধজীবের জ্ঞান

এবং প্রত্যেক বস্তুকে ব্রহ্মোস্থিত বলিয়া যে জ্ঞান তাহা জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞান। আর দেহান্তে চিদানন্দময় সদ্ব্রহ্মস্বরূপেরই যে সর্বত্র সর্বদা স্ফুরণ তাহা বিদেহমুক্ত পুরুষের জ্ঞান। কেবল বস্তুবিষয়ক জ্ঞান জীবের যে অবস্থায় হয় তাহাকে বদ্ধাবস্থা বলে। এই জ্ঞানের নামই অবিদ্যা, কারণ ইহাতে গুণাত্মক প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে আশ্রয়রূপে যে পূর্ণ চিন্ময় সদ্ব্রহ্ম আছেন তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অবস্থায় প্রত্যেক জাগতিক বস্তুকে আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত রূপে দর্শন হয়, সেই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তাবস্থা। ব্যষ্টিজ্ঞানের অনন্ত প্রকার ভেদ আছে, অতএব স্বরূপজ্ঞানবিবর্জ্জিত কেবল গুণাত্মক বস্তুমাত্রের জ্ঞানও ব্রহ্মে থাকা অবশ্যম্ভাবী। কারণ গুণও তাঁহার অংশবিশেষ; এই অংশমাত্রের জ্ঞানও এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান, তাহা তাঁহার চিচ্ছক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া এই চিচ্ছক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। যেমন একটি পূর্ণ বৃক্ষের দর্শনের অন্তর্ভূতরূপে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাদি অঙ্গের দর্শনও থাকা অবশ্যম্ভাবী; সম্যক্ বৃক্ষ দর্শনের অন্তর্ভূতরূপে পত্রাদি অঙ্গের পৃথক্ দর্শনও অবশ্য আছে ইহাও তদ্রূপ জানিবে। এই গুণাংশের মাত্র জ্ঞানই বদ্ধাবস্থার জ্ঞান; ইহাই অবিদ্যা। ইহাতে আশ্রয় স্থানীয় চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম অপ্রকাশ থাকেন। এই পূর্ণানন্দের দর্শনাভাবই দুঃখের মূল। অতএব বদ্ধজীবের দুঃখও অবশ্যম্ভাবী; এবং দুঃখ কেন আছে এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্রই বলা যাইতে পারে, যে ব্রহ্মের স্বরূপই এবংবিধ। এতৎসমস্ত মিলিত হইয়া তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বররূপী ব্রহ্মে পূর্ণ আনন্দ নিত্য বিরাজমান। তাঁহার

অঙ্গীভূত ব্যষ্টি-দর্শন-শক্তিযুক্ত মুক্তজীবে স্বীয় ও দৃশ্য পদার্থ সকলের আশ্রয়ীভূত চিৎস্বরূপের জ্ঞানের অভাব না থাকায় মুক্তজীবসকল ঈশ্বরসহ (অর্থাৎ অঙ্গীভূতভাবে) জীবন্মুক্তাবস্থায় মিশ্রিত ভাবে, বিদেহমুক্তাবস্থায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবও ঈশ্বরাঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয়ীভূত চিদ্‌রূপ তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায় গুণময় দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহারা দুঃখভাগী হইয়া থাকেন।

দেহে যে আত্মবুদ্ধি হয়, তাহাও অমূলক নহে; কারণ গুণময় দেহেও ব্রহ্মেরই স্বরূপান্তর্গত, বদ্ধাবস্থায় নিজেরও ঐ গুণময় দেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিৎ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত থাকে না, কেবল গুণ মাত্রই দর্শনের বিষয়ীভূত থাকে; সুতরাং ঐ গুণাত্মক দেহেই আত্ম-বুদ্ধি হয়। জীবন্মুক্তাবস্থায় নিজের ও সর্ব্বদেহের আশ্রয়ীভূত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, নিজ দেহের ও সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকাশিত হয়। দৃশ্য দেহাদিতে তদবস্থায়ও আত্মবুদ্ধি থাকে; পরন্তু সেই আত্মবুদ্ধি ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি, বদ্ধাবস্থার ন্যায় গুণাত্মক বুদ্ধি নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সমস্ত ভূতবর্গকে প্রথমে নিজ আত্মাতে এবং অবশেষে ব্রহ্মেতে স্থিত বলিয়া দর্শন হয় ("যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" ৪র্থ অঃ ৩৫ শ্লোক)। শ্রুতিও বহুস্থলে এইরূপই বলিয়াছেন। (গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ৪৯-৫৪)

......ঈশ্বর নিত্য সম্যক্ দ্রষ্টা হওয়ায় তিনি জাগতিক সমস্তরূপকে স্বীয় আনন্দাংশের প্রকাশভাবমাত্র বলিয়া জানেন– তাঁহার নিজেরই

স্বরূপমধ্যে স্থিত বলিয়া দর্শন করেন ; এই দর্শন আনন্দেরই দর্শন; অতএব তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অজ্ঞান অথবা দুঃখানুভব নাই। জীব তাঁহার অংশ হইলেও স্বভাবতঃ অসম্যগ্‌দর্শী ; দৃশ্যস্থানীয় আনন্দাংশের প্রতি বিশেষরূপে অভিনিবেশ বশতঃ, স্বীয় দ্রষ্টস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এবং কেবল নিজের ভোগ্য সামগ্রীরূপে দৃশ্যের জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া যখন বর্ত্তমান হয়েন, তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎকেও চৈতন্যবিহীন—কেবল ভোগ্য অচেতন পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন, ইহাই অবিদ্যার স্বরূপ। অবিদ্যাযুক্ত জীবকে বদ্ধজীব বলে।

আর যখন জীব ঈশ্বরের বিধানানুসারে স্বীয় চিদ্রূপে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, যখন স্বীয় চিদ্রূপকেও সম্যক্ জ্ঞাত হয়েন তখন দৃশ্যস্থানীয় জগৎও চিদানন্দময়রূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। তিনি আর জগৎকে অচেতন দেখেন না ; তদবস্থায় তাঁহাকে মুক্তজীব বলা যায়। পরন্তু চিদ্রূপের দর্শন হইবামাত্রই জগতের অচেতনত্ব-বিষয়ক সংস্কার তিরোহিত হয় না ; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পরও অচেতন-দেহধারীরূপে তিনি জীবিত থাকেন। যখন ভোগের দ্বারা এই সংস্কার সম্যক্ তিরোহিত হয়, তখন তাঁহার স্থূল দেহ প্রথমে বিযুক্ত হয়, তিনি সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মলোকে গমন করেন ; যাইতে যাইতে ক্রমশঃ তাঁহার সূক্ষ্মদেহের সংস্কারও বিলুপ্ত হইতে থাকে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর একেবারে বিলুপ্ত হয় ; তখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার আনন্দরূপতা লাভ করে, তিনি নিজে আনন্দময় হইয়া চিদ্রূপে সম্যক্

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহাই পরম মোক্ষ, যাহাকে কৈবল্য অথবা বিদেহমুক্তি বলা যায়। ব্রহ্মদর্শন হইবার পর যতদিন তিনি স্থূল দেহধারীরূপে জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়; চিদ্রূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেও জগতের প্রতি অচেতন বুদ্ধির পূর্ব্ব সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। বালককালে একস্থানে ভূত আছে শুনিয়াছিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতরূপে জানিলে যে তথায় ভূত নাই, কিন্তু এইরূপ জানিলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যেমন সেই স্থানে একক রাত্রে যাইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, ইহাও তদ্রূপ। স্থূলদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার, তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সূক্ষ্মদেহধারী বলিয়া যে সংস্কার (মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আমার স্বরূপগত বলিয়া যে সংস্কার) তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ়। প্রাক্তন ভোগের দ্বারা স্থূলদেহের সংস্কার দূরীভূত হইলে, সূক্ষ্মদেহের সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না; অতএব স্থূল-দেহের সংস্কার বিলুপ্ত হইলে ঐ দেহ সূক্ষ্মদেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া পতিত হয়; জীব তখন সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোকগত হয়। তথায় ঐ দেহের সংস্কারও সম্যক্ বিলুপ্ত হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় রূপে ঐ সূক্ষ্মদেহের উপকরণ সকল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আনন্দময় রূপে ইহাদের প্রতিষ্ঠা সর্বদাই ছিল, কিন্তু তদাশ্রিত জীবচৈতন্য বদ্ধাবস্থায় স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, তিনি ইহারও যথার্থ চৈতন্যময় স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিয়া দুঃখভাগী হইয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই ভ্রম ঈশ্বরকৃপায় বিদূরিত হওয়ায় পুনরায় চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এক কথায়

বলিতে হইলে চিদ্রূপতার বিস্মৃতিই বন্ধ হেতু, চিন্ময়তার সাক্ষাৎকারই মোক্ষহেতু, চিদানন্দময়রূপে প্রতিষ্ঠাই মোক্ষ।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ১৯৩)

ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি

......এই সংসারে যথার্থ সৎ ও উত্তম মনুষ্যদিগের দেহান্তে দ্বিবিধ পন্থায় গতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি পন্থাকে ধূমমার্গ এবং অপরটিকে অর্চ্চিরাদি মার্গ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। সকাম অথচ অতি পুণ্যাত্মা জনগণ দেহান্তে পূর্ব্বোক্ত ধূমমার্গ প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় আপনাপন স্বর্গ-সুখভোগোপযোগী কর্ম্মানুরূপ স্থান সকল প্রাপ্ত হয়েন। তথায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভোগের দ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই মর্ত্ত্য ভূর্লোকে পতিত হয়েন, এবং ইহলোকের ভোগোপযুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; সেই কর্ম্মানুসারে পুনরায় পরলোকপ্রাপ্তি এবং পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ, এইরূপ যাতায়াত তাঁহাদের নিরন্তর ঘটিয়া থাকে। অতএব ধূমমার্গে স্বর্গলোকে গমনকারী মনুষ্যের সংসারে যাতায়াত ও তথাকার সুখ-দুঃখাদিভোগ নিবৃত্ত হয় না পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের ভজন দ্বারা অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যাত ভক্তি কিম্বা জ্ঞানমার্গের নিষ্কাম ভজনাবলম্বনে সিদ্ধমনোরথ হয়েন, তাঁহারা

দেহান্তে ধূমমার্গে গমন না করিয়া অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রাপ্ত হয়েন। এই মার্গে তড়িদ্বেগে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যমণ্ডল ভেদপূর্ব্বক তাঁহারা অবশেষে ক্রমশঃ ভগবৎলোক প্রাপ্ত হয়েন। অনেকেই স্বীয় স্বীয় ভজনানুরূপ ঐ সকল লোকে বাস করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। আর যাঁহারা জীবিত কালেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন (ইঁহাদের সংখ্যা যুগে যুগেই অতি অল্প জানিবে), তাঁহারা ঐ সকল ভগবৎলোকও অতিক্রম করিয়া নামরূপাবদ্ধতা বর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষ-স্বরূপ আনন্দময় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকরূপে অচ্যুতানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; ইহাকেই সত্বমুক্তি বলে। যাঁহারা বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি ভগবদ্ধামে বাস প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদেরও সাধারণতঃ মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ান্তে যেরূপ স্বর্গে বাসপ্রাপ্ত পুণ্যাত্মা মনুষ্য সকলের মর্ত্ত্যলোকে পতন হয় বলিয়াছি, তদ্রূপ পতন তাঁহাদের হয় না। মর্ত্ত্যলোকে অধিক ক্লেশ দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কখনও তাঁহারা তথায় অবতার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু দেহান্তে তাঁহারা পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চিত্তে যদি বৈষয়িক মলিনতা কিঞ্চিৎ থাকিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা দূরীকরণের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় কোন না কোন সূত্রে অভিসম্পাত আদি কারণে তাঁহাদেরও (যথা জয় বিজয় আদির) মর্ত্ত্যলোকে পতন হওয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই পতন নির্দ্দিষ্টকাল মাত্র স্থায়ী; সেই কাল অতীত হইলে তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবল্লোকে পুনরায় স্বীয় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েন। পরে তথায়

নিরন্তর ভগবৎসঙ্গ হেতু ক্রমশঃ ভেদবুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা পরম মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হয়েন ও পরে মোক্ষপদ লাভ করেন। ইহা ক্রমমুক্তি নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ২১৬-২১৭)

ব্রহ্মবিৎ পুরুষের শক্তিমত্তা (ঐশ্বর্য্য)

........বিমুক্ত জীবের যে অপরিসীম শক্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে। বদ্ধাবস্থায় সে সমস্ত শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না। পরন্তু তপস্যা ও ভজনের দ্বারা যেমনই দেহ নির্ম্মল হইতে থাকে, তেমনি নানাবিধ শক্তি জীব লাভ করিতে থাকেন। পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় যে সকল শক্তি প্রকাশিত হয়, প্রায় তদ্রূপ শক্তি ব্রহ্মজ্ঞ জীবিত পুরুষেরও আয়ত্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পূর্ব্বেও যে সাধকের বহুবিধ অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা :—মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৫০।৫১ অধ্যায়ে চ্যবন ঋষির সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থলে সলিল মধ্যে তিনি বহুবর্ষ বাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর মৎস্য ধৃত করিবার নিমিত্ত কৈবর্ত্তগণ ঐ স্থানে জাল নিক্ষেপ করিলে বহু মৎস্যের সহিত চ্যবন ঋষিও জালে আবদ্ধ হইয়া উপরে নীত হয়েন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে নহুষ নৃপতি কৈবর্ত্তগণকে গোদান করিয়া তাঁহাকে মৎস্যের সহিত মুক্ত

করিলে ইনি এই সকল মৎস্য এবং ধীবরগণকে নৃপতি নহুষ ও অপর দর্শকবৃন্দের সাক্ষাতে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৌভরি ঋষির সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, ইনি নৃপতি মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ করিয়া যোগবলে তাহাদের নিমিত্ত পঞ্চাশৎ পৃথক্ পৃথক্ সুরম্য ভবন প্রস্তুত করেন এবং স্বয়ং এককালে পঞ্চাশৎ পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ পঞ্চাশৎ পত্নীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভবনে বহু বৎসর ধরিয়া যুগপৎ বাস ও বিহারাদি করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের পিতা কর্দ্দম ঋষির কথা উল্লেখ আছে যে, তিনি যোগবলে দাসদাসী ও পশুপক্ষী সমন্বিত এক দিব্য বিমান প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পত্নী দেবহুতির সহিত তদুপরি আরোহণ করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ ও বিহার করিয়াছিলেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্ঠিতম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বামিত্র রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ঐ রাজার অনুচর রূপে চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে নারিকেল ফল বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া এযাবৎ প্রসিদ্ধি আছে। পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ যখন এই সকল অভাবনীয় কার্য্যসম্পাদন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হয়েন নাই। পরে সাধন অবলম্বন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। ইহা উক্ত পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণের সামর্থ্য ইহা অপেক্ষা অশেষগুণে অধিক। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সমস্ত বিশ্বকে আত্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্

বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভূতগ্রামকে আপনার আত্মাতে ব্রহ্মবিৎ যোগীগণ দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হয়, যথা :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ।।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।।"৩০

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণের দশম শ্রুতিবাক্যেতে উল্লেখ আছে যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বময়তা লাভ করেন"। অতএব এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন যে, 'আমি মনু হইয়াছিলাম, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম' এবং এখনও যিনি ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানিয়াছেন, তিনি আপনাকে সর্ব্বময় দর্শন করেন। দেবতারাও তাঁহা অপেক্ষা অধিক বলশালী বিবেচিত হয়েন না এবং তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন না, কারণ তিনি এই সকল দেবতারও আত্মা হয়েন" (তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশত, আত্মা হ্যেষাং স ভবতি)।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ১৩৭-১৩৯)

শত্রুর প্রতি ও পাপিষ্ঠের প্রতি কিরূপে কার্য্যতঃ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা যাইতে পারে ?

........কিন্তু সর্ব্ববিধ শাস্ত্র এবং সর্বযুগে আবির্ভূত মহাত্মা ঋষিগণ একবাক্যে এই বলিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে কেহই কাহারও অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। তোমার যে কিছু লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ এইজন্মে ভোগ হয়, তৎসমস্তই তোমার নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মের ফল। নারদ পঞ্চরাত্রে অতি উত্তম ভাবে এই সত্য বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"প্রাক্তনাৎ সুখদুঃখঞ্চ রোগঃ শোকো, ভয়ং পিতঃ।
সুমৃত্যুরপমৃতুর্বা চিরায়ুরল্পজীবনম্ ॥
যত্রকালে চ যন্মৃতুর্ভবনং শুভকর্ম চ।
ন্যূনাধিকং ক্ষণং নাস্তি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥
যস্ত হস্তে চ যন্মৃতুর্বিধাত্রা লিখিতঃ পুরা।
ন চ তং খণ্ডিতুং শক্তঃ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ" ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও মহাজন বাক্যে সর্বত্রই এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাকে কেবল নিমিত্ত মাত্র খাড়া করিয়া তোমার পূর্বকৃত কর্ম্মসকল তোমাকে ইহজন্মে লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ ইত্যাদি ফল দিতেছে। অতএব সেই নিমিত্তমাত্র স্থানীয় ব্যক্তিকে তোমার অনিষ্টকারী বলিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া কি সম্পূর্ণ মূর্খতা নহে ? এক ব্যক্তি অন্তরালে থাকিয়া দণ্ডের দ্বারা

তোমাকে আঘাত করিল, তুমি আঘাতকারী ব্যক্তিকে না দেখিয়া সেই দণ্ডকে আঘাতকারী বোধ করিয়া যদি সেই দণ্ডের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হও তবে কি ইহা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচয় নহে ? অতএব বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার অনিষ্টকারী অপর কেহ নাই। যদি তোমার অনিষ্ট বলিয়া কিছু মনে কর, তোমার পূর্বকৃত কর্মই সেই অনিষ্টের মূল। তুমি নিজেই তোমার অনিষ্টকারী, অপর কেহ নহে।

দ্বৈতবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ বিচার দ্বারা দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব বিরহিত হইয়া শান্তি অবলম্বন করিবে। কর্মের গতি অনুসারে দুঃখ উপজাত হইবার সময় উপস্থিত হইলে পরম মিত্রও শত্রুভাবাপন্ন হয়। আর সুখ লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইলে পরম শত্রুও মিত্র ভাবাপন্ন হয়। ইহা সচরাচর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে বুদ্ধিমান্ পুরুষ শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের প্রতি আপন কর্ত্তব্য কর্ম শাস্ত্রবিহিতরূপে প্রতিপালন করিবে। দ্বৈতভাবাপন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে এই উপদেশ। পরন্তু যিনি শ্রুতি শাস্ত্রের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপারের নিয়ন্তা এক পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি জানেন যে পাপ পুণ্য সমস্তই মূলতঃ ঈশ্বরাধীন জীবের স্বতন্ত্ররূপে কর্ম সামর্থ্য কিছুই নাই। কারণ :—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গীতা ১৮শ অঃ ৬১ শ্লোক

অন্বয়ার্থঃ — (ভগবান বলিতেছেন) হে অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থিত থাকিয়া সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিজ মায়াশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত (ভ্রাম্যমান) করিতেছেন। সুতরাং—

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥"

গীতা, ৬ অঃ ৯ শ্লোক।

এবঞ্চ

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

গীতা, ৫ অঃ, ১৮ শ্লোক।

(অর্থাৎ সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের পাত্র, বন্ধু, সাধু এবং পাপী এতৎ সমস্তের প্রতি সমবুদ্ধি স্থাপন করাই প্রশংসনীয়; বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে জ্ঞানিগণ সমদর্শী হন।)

এই সমস্ত গীতা বাক্যার্থের এবং অপরাপর শাস্ত্রেরও উক্ত প্রকার বাক্যার্থের সত্যতা জ্ঞানী পুরুষ অনুভব করিয়া সর্বত্র সমদর্শী হয়েন এবং তাঁহার আভ্যন্তরিক শান্তির কদাপি চ্যুতি হয় না।

পরন্তু যিনি গুরূপদিষ্ট বেদান্ত বাক্যের গুহ্যতম সার অবগত হইয়া আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে প্রকাশিত সর্ব্বজীবের সর্ব্ববিধ অবস্থা অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে,তাঁহার ঈক্ষণশক্তি প্রভাবে বিভিন্নরূপে

প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। ইহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে তোমার নিক
বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং এবংবিধ পুরুষ সাংসারিক সুখদুঃখা
সকলেরই অতীত। তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। সুতর
নিন্দাস্তুতি উভয়কেই তিনি তুল্য বোধ ত করিবেনই। কেমন, এক
তোমার সন্দেহ দূর হইয়াছে? (গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ৬৬-৬৯)

জীবকে ঈশ্বর পাপে কেন নিযুক্ত করেন?

........যে কর্ম্মের ফলে কর্ম্মকর্ত্তার দুঃখভোগ হয় তাহাকে পাপ এ
যে কর্ম্মের ফলে কর্ম্মকর্ত্তার সুখ ভোগ হয় তাহাকে পুণ্য বলে
কর্ম্মকর্ত্তার সুখদুঃখভোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কর্ম্মের পুণ্য
পাপ সংজ্ঞা হয়। যেমন বস্তু সকলের রূপাদি ও গুণের বিভিন্ন
দৃষ্টে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হয়—অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যা
সংজ্ঞা হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম সকলেরও ফলের প্রভেদ দৃষ্টে তাহাদের প
ও পুণ্য সংজ্ঞা হয়। প্রাণহানিকর হলাহলও জগতে আ
আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ঔষধাদিও জগতে আছে। সময়মত উভয়ের প্রয়ো
জনীয়তাও আছে। বস্তুতঃ কোন দুইটি বস্তু জগতে ঠিক এক
নহে। প্রত্যেক বস্তুতেই কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহা অপরের ম
নাই। প্রত্যেক বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ পাতা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটিরই অ
সকল হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও থাকে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মস
অনন্ততাই প্রকাশ পায়। কর্ম্ম সকলের পাপ পুণ্যাদি প্রভেদও
প্রকার। যে সকল শক্তির দ্বারা জগতের স্থিতি নিয়মিত হইতে

তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটি পরমাণুতে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিও জগতের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এই একটি পরমাণুর যদি এক-কালীন বিনাশ সম্ভব হয়, তবে সমস্ত বিশ্ব উলট্ পালট্ হইয়া যায়। সেই পরমাণুর শক্তির অভাব হেতু অপর সমস্ত শক্তির কার্য্য বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন একটি লৌহ নির্ম্মিত কল বৃহৎ হইলেও তাহার কোন স্থানের একটি ক্ষুদ্র পেরেক খসিয়া পড়িলে সেই বৃহৎ কল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগদ্রূপ বৃহৎ কলের একটি পরমাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জগতের ব্যাপার সমস্ত বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কোন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন যে "তোমার মনে এক্ষণে যে একটি ক্ষুদ্র চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ, কিন্তু জানিবে যে ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহার অনিবার্য্য ফল এই মুহূর্ত্তে তোমার মনে এই চিন্তাটি উদয় হওয়া; এবং এই চিন্তাটি যে মুহূর্ত্তে উদয় হইয়াছে তৎপর মুহূর্ত্তেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় সত্য—কিন্তু ইহার শক্তি অবিনাশী—অনন্তকাল স্থায়ী, অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ইহা চালিত করিবে। অতএব এই ক্ষুদ্র চিন্তাটি তুচ্ছ পদার্থ নহে।" দেখ একটি দীর্ঘিকার জলে একটি ক্ষুদ্র ইটের ডেলা তুমি এইক্ষণ নিক্ষেপ কর, ইহা অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া তুমি মনে করিবে সন্দেহ নাই। বালক সকল সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে। ইহা একটি অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্য বলিয়া সকলেই মনে করে। কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিলে দেখিবে যে ঐ ক্ষুদ্র ঢিলটি জলে পতিত হইয়া যে স্থানের জলে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানের জলীয় বিন্দুসকলকে

আঘাত করাতে সেই জলীয় বিন্দু সকল সরিয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলীয় বিন্দু সকলকে আঘাত করিয়াছে। সেই পার্শ্ববর্ত্তী বিন্দু সকল পুনরায় তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিন্দু সকলকে আঘাত করিয়াছে। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া বৃহৎ দীর্ঘিকার প্রান্তস্থানে স্থিত মৃন্ময় তীরে গিয়া আঘাত করিতেছে। সেই আঘাত যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার শক্তি ব্যর্থ হইবার নহে। ইহা অবশ্য জল সংলগ্ন মৃত্তিকাখণ্ডে সঞ্চারিত হইবে, এবং তাহাতে সঞ্চারিত হইলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইবে, পুনরায় পৃথিবী হইতে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইবে। অতএব এই ক্ষুদ্র ঘটনার ফল কত মহৎ, তাহার কূল ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। এইরূপ মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের ফলই সমস্ত বিশ্বব্যাপী। যত ক্ষুদ্রই হউক প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্য্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কোন এক স্থানে ইহা দৃষ্টতঃ দুঃখ ফল উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের equilibrium (স্থিরতা) রক্ষা করিতে ইহা একটি অত্যাবশ্যক শক্তি।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ৬৯-৭১)

......বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার কোন অঙ্গবিশেষের (জীবের) দ্বারা দুঃখ দায়ক পাপকার্য্য সাধন করিয়াও জগতের কল্যাণই সাধন করিতেছেন; তবে যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করে, সেই ব্যক্তির তন্নিমিত্ত দুঃখভোগ অবশ্যই করিতে হয়। তুমি বাম হস্তে শৌচকর্ম্ম করিয়া থাক, ইহা দ্বারা তোমার সমগ্র শরীরের কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু শৌচকর্ম্ম করিবার দরুণ তোমার বামহস্ত দুর্গন্ধময় হইয়া অপবিত্র

হয় ; পরে মৃত্তিকা প্রভৃতি ঘর্ষণের দ্বারা ঐ দুর্গন্ধ দূর হয় এবং হাত পবিত্র হয়। তদ্রূপ ঈশ্বর কোন জীবরূপ অঙ্গের দ্বারা যাহাকে পাপ বলা যায় এমন কর্ম্ম করাইয়া জগতের কল্যাণই বিধান করেন ; কিন্তু সেই জীবরূপ অঙ্গের সেই কর্ম্মনিবন্ধন দুঃখভোগও অবশ্য হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা সেই জীব পরে বিশুদ্ধতা লাভ করে।

পরন্তু এই উপদেশ দ্বারা যেন পাপকর্ম্মে তোমার মতি বর্দ্ধিত না হয়। জ্ঞানী পুরুষ পাপ পূণ্যে সমভাব অন্তরে রাখিবেন সত্য, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং কখন পাপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না এবং পাপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিবেন না। পাপকর্ম্মকারীর বুদ্ধি কদাপি এমন নির্ম্মল অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে না যাহাতে পূর্ব্বোক্ত নির্ম্মল জ্ঞান তাহার অন্তরে স্থান পাইতে পারে, যেটুকু নির্ম্মলতা থাকে তাহা পাপকর্ম্মের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার অধঃপতন ও দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। অপরের কার্য্যে পাপ দর্শন করিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হওয়াই উক্ত জ্ঞান সাধনের শুভ ফল, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে ; সেই শক্তি ভগবৎ শক্তি ; তাহাকে ভগবৎ শক্তিরূপে মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করিবে। কোন শক্তিকেই অবজ্ঞা করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান হয় সত্য, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, চন্দনকে যেমন পূজাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায় বিষ্ঠাকেও তদ্রূপ ব্যবহার করা যায়। এইরূপ বিকৃত জ্ঞান যেন তোমার না হয়। বিষ্ঠার শক্তি ও চন্দনের শক্তিতে অনেক প্রভেদ, সুতরাং উভয়ের ব্যবহারের ফল এক প্রকার

নহে। বিষ্ঠা শূকরাদি জীবের আহার্য্য, তদ্দারা তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন হয়। চন্দন আহার করিলে তাহাদের সেই পুষ্টিসাধন হয় না। চন্দনের দ্বারা তোমার শরীর লিপ্ত হইলে তদ্দারা যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় বিষ্ঠালেপনের দ্বারা তাহার বিপরীত ফল হইবে, তদ্দারা তোমার তামসিক বৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তোমার বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিবে এবং শরীরে রোগ উৎপাদন করিবে। অগ্নি ও হলাহল প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে; ইহা ভগবৎ শক্তি। এই শক্তির অবজ্ঞা করিয়া যিনি ব্যবহারে অপর দ্রব্যের সহিত ইহাদের সমতা করিতে যাইবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। সকল বস্তুই ব্রহ্মময়, এইরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া যিনি অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিবেন, তাঁহারও হস্ত দগ্ধ হইবে; যিনি হলাহল পান করিবেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। ইহা বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান নহে; কারণ অগ্নিতে ও হলাহলে যে ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া তিনি মূঢ়বুদ্ধি বশতঃই ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ সাধক প্রত্যেক বস্তুতে নিহিত শক্তিকে ভগবৎ শক্তিজ্ঞানে তাহার পূজা করিবেন; তাহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবেন না। ঋষিগণ বস্তু সকলের ও কার্য্য সকলের বিশেষ বিশেষ শক্তি অবগত হইয়া কোন্ বস্তুকে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে (যেমন কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে, কোন্ বস্তু আহার করিতে হইবে না, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে না ইত্যাদি) শাস্ত্রমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যবহার বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু এক বস্তুর শক্তি অপর

বস্তুর শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে সত্য, যেমন রোগের শক্তি ঔষধের শক্তি দ্বারা প্রতিহত হয়। সাধকগণও ক্রমশঃ সাধনাদি দ্বারা এমন শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন যে সেই অবস্থায় তাঁহারা অপর সমস্ত পদার্থের শক্তির কার্য্য প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্রের অধীনতা অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। পরন্তু তাঁহারা কার্য্যতঃ সচরাচর ব্যবহার শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচরণ করেন। ইহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত। ......

........ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ কখন কখন বিশেষ কারণে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাহা জগতের বিশেষ কল্যাণার্থ, সেই সকল কর্ম্ম তাঁহাদিগের চিত্তকে কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ("তেজীয়সাং ন দোষায়, বহ্নেঃ সর্ব্ব ভুজো যথা"—২৯ শ্লোক, ৩৩ অঃ, ১০ম স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব সাধারণ জনগণের পক্ষে তাঁহাদের সেই সকল আচরণ কদাপি অনুকরণীয় নহে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। (গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ৭৫-৭৮)

বিগ্রহোপাসনার মহিমা

........সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়, এতৎ সমস্ত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ইহা শ্রুতি, স্মৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে নিশ্চিতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা জ্ঞাত হইয়াই সাধক আনন্দ লাভ করেন—নিজে আনন্দময় হয়েন;

ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহা যদি সার সত্য হয়, তবে ভগবানের স্বচ্ছ অবতার রূপকে সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ধারণা করা কি সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য নহে? যিনি আপনার কল্যাণার্থী, যিনি অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ ভগবদ্বিগ্রহে কি ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে অভ্যাস করা সর্ব্বাগ্রে উচিত হয় না? ইহাও যিনি না করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ভাগ্যহীন বই আর কি বলা যাইবে?

........অতএব আত্মকল্যাণার্থী সাধক পুরুষ কখন ভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি স্থাপন করিবেন না। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই অবতার দেহে ভগবদ্ভাব উত্তমরূপে পোষণ করিতে পারিলে তাহার ফলে শীঘ্র শীঘ্র সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের স্ফুরণ হইতে থাকে।

আর আমাদের সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তিই উপাসনার মুখ্য অবলম্বন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনে শীঘ্র সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া অন্তর নির্ম্মল হয়; তখন তিনি কৃপা করিয়া শীঘ্র সাধককে তাঁহার প্রকৃত চিদানন্দময়রূপ প্রদর্শন করেন এবং সাধক কৃতার্থ হয়। বস্তুতঃ ভগবানের নির্ম্মল সত্ত্বময় লোকের ভিতর দিয়া গমন করিয়াই সকল প্রকার উচ্চ সাধককে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে হয়; জীবন্মুক্ত পুরুষগণও দেহান্তে অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে ঐ উচ্চতম সত্ত্বময় লোকে প্রথম নীত হয়েন, তৎপর তাঁহারা পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শ্রুতিবাক্য সকলের বিচারের দ্বারা বেদান্ত দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। জীবিতকালেও সাধক সেই সত্ত্বময়তার ভিতর

দিয়া গমন করিয়াই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়তা লাভ না করিলে—চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে ব্রহ্মদর্শন হয় না। সত্ত্বগুণাধিপতি ভগবানের উপাসনাতেই এই নির্মলতা শীঘ্র লাভ করা যায়। যাঁহারা জ্ঞানযোগাবলম্বনে কেবল নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহারাও ঐ ধ্যানের বলে ইহার সাক্ষাৎ ফল স্বরূপে সগুণ ব্রহ্মাকেই প্রাপ্ত হয়েন।

(গুরুশিষ্য সংবাদ পৃঃ ১৪৬-১৪৭)

দুর্বল নৌকার পক্ষে সমুদ্র লঙ্ঘন কার্য্য অতিশয় কঠিন; বলবান্ জাহাজের সহিত বাঁধিয়া দিলে নৌকা যতই দুর্ব্বল হউক, ইহা অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে সেই অব্যক্ত, বাক্য মনের অগোচর বস্তুকে ধারণা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু আমি বলবান্, আমার সহিত যুক্ত হইলে আমি সহজে তাহাকে পার করিয়া দিই; এই নিমিত্ত আমার উপাসকগণকে অধিক বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ বলিলাম। অক্ষরোপাসক ("ন কিঞ্চিদপিচিন্তয়েৎ") কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না, মনকে এমন নিরবলম্ব অবস্থায় রাখিবেন যাহাতে কোন প্রকার চিন্তা না আসে। এইরূপ অবস্থায় মনকে রাখা কত কঠিন, তাহা যিনি এইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই জানেন এবং তিনিই বুঝিতে পারেন পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য সকল কত সত্য। এই শ্লোকগুলি গীতার ১২ অঃ ১—৭ সংখ্যক শ্লোকগুলি অতি সহজ ভাষায় গঠিত এবং ইহাদের অর্থ অতি সুস্পষ্ট; পরন্তু কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে ভগবানের মতে অব্যক্তের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। যাহা

হউক ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। শ্লোকের ভাষা অতি সহজ, ভা
দৃষ্টে তোমরাই এই বিচার অনায়াসে করিতে পারিবে। অবা
যাঁহারা চিত্তের সমাধান করিতে পারেন তাঁহারা করুন ; ইহাতে কে
নিষেধ নাই। কিন্তু ইহাতে ফল লাভ বিলম্বে হয়। মোক্ষ ফল লা
সকলের উদ্দেশ্য, পরন্তু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অক্ষরোপাসনা অপে
সহজে সেই ফল তাঁহার সগুণ ভাবের উপাসনায় লাভ করা যায় ; এ
নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাই অবলম্বন করে
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, বিশ্বপ্রকাশক, আনন্দময় পরব্রহ্ম স্বরূপ
অমূর্ত্ত, বাক্য মনের অগোচর, অচিন্ত্য হইলেও ভক্তগণের স্থচি
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে সদা বিভূষিত, মনোহর, শুদ্ধসত্ত্বময় তনু জগতে
কল্যাণার্থ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন ; তিনি ভিন্ন জীবের গ
নাই এইরূপ বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ তাঁহার ধ্যান উপাস
করিয়া থাকেন। অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্তমূর্ত্তি ভগবানেরও ধ্যান
উপাসনা বৈষ্ণবদিগের আদরনীয়—এই প্রকার উপাসনাও কেহ
অবলম্বন করেন। আর বিশ্বাতীত অথচ সর্বগত, কেবল চৈতন্যস্ব
পুরুষোত্তম রূপেও বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ ভগবদ্ধ্যান করিয়া থাকে
অপর কেহ কেহ "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইত্যাদি শ্রেণীর বাক্যে
প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা স্থাপন করিয়া চিত্তকে সর্বপ্রকার ধ্যেয়বর্জ্জিত
মাত্রাবস্থায় অবস্থিতিরূপ নিরবচ্ছিন্ন অব্যক্তোপাসনায় প্রবৃত্ত হই
ইচ্ছা করেন। পরন্তু এই উপাসনা কঠিন, ইহা সাধারণতঃ উপদে
নহে, কারণ ইহা ধারণা করিবার যোগ্যতা অল্প লোকেরই আ
যাঁহারা সাকার উপাসনায় ভক্তি স্থাপন করিতে অসমর্থ, তাঁ

কাজেই অক্ষরোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। (গুরুশিষ্য সংবাদ পৃঃ ১৫২—১৫৪)

বিশ্বরূপদর্শন করিয়াও অর্জ্জুনের অজ্ঞান কেন দূর হইল না?

........নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য তুমি এক বাঘ সাজিয়া যাইতে পার ; যিনি ইহা অবগত হয়েন, তিনি জানেন যে, সেই বাঘের সমস্ত অভিনয় তোমারই কার্য্য সেই বাঘ তুমিই, অন্য কেহ নহে ; তাঁহার এই জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞান। পরন্তু সেই বাঘ দেখা আর তোমাকে দেখা এক কথা নহে। এইরূপ ভগবান্ যখন যখন অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল অবতার তিনিই, এবং অবতারের সমস্তকার্য্য তাঁহারই কার্য্য ; পরন্তু অবতার দর্শন, আর তাঁহার নিজ স্বরূপের দর্শন এক নহে , সুতরাং এক প্রকার ফলদায়ক নহে। অতএব অবতার শ্রীকৃষ্ণকে বহুলোকে দর্শন করিয়াছিল সত্য, সেই দর্শনও তাহাদের অশেষবিধ কল্যাণ উৎপাদন করিয়াছিল ; কিন্তু যে রূপ দর্শন করিলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মপাশ হইতে জীব বিমুক্ত হয় ("ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে") ইহা সেই রূপ নহে; ইহা অবতার রূপ, লীলার নিমিত্ত ভগবান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর যে অনন্ত বিরাট্ রূপের কিয়দংশ অর্জ্জুনকে এবং কিয়দংশ দুর্যোধনাদিকে ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও একপ্রকার

প্রাকৃত রূপ। ইন্দ্র, সূর্য্য, বসু, রুদ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি যাহ
অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন তৎসমস্তই প্রাকৃতিক দৃশ্য। এইরূপও পূর্বোক্ত
শ্রুতির লক্ষ্যীকৃত রূপ নহে—যাহার দর্শনমাত্র জীব কর্ম্ম পাশ হইতে
বিমুক্ত হইয়া পাপ-পুণ্য বর্জ্জিত হয়।

ব্রহ্মের চতুর্বিবধ রূপ আছে তাহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি
সদ্রূপ এবং চিন্ময়রূপ এই দুইটিই তাঁহার অমূর্ত্ত রূপ; প্রকাশিত অন
জগৎ-রূপ এবং সমস্ত বিশেষ রূপ এই সদ্রূপ হইতে প্রকাশিত হ
এবং সদ্রূপেতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সেই চিদানন্দময় রূপকে লক্ষ
করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন যে তাহা দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি সম
ছিন্ন হয়, সংসার দূর হয় এবং কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (গুরু শি
সংবাদ পৃঃ ১৪০—১৪১)

অবতারত্ব নিরূপণ

... ... বস্তুতঃ কেহ অবতার কিনা এবং অবতার হইলে কাহ
অবতার ইহাও কেবল তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে কখনই নিরূপণ করি
পারা যায় না। যে কোনও অবতারে যে কোনও শক্তি প্রকাশি
হইয়াছে প্রায় তদনুরূপ অথবা কখন কখন তদধিক শক্তিও বি
ঋষিগণ ও অপর সিদ্ধ পুরুষগণ সময় সময় প্রকটিত করিয়াছেন বলি
শাস্ত্রে উল্লেখ থাকা দেখা যায়। জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধেও এইরূপ। সুত
কোন শক্তি প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যদৃষ্টে অবতারত্ব অবধারিত হয় ন
কোন্ দেহকে আশ্রয় করিয়া কে কার্য্য করিতেছেন ইহা সাধ

সম্বন্ধে দর্শন করিবার শক্তি প্রজ্ঞানেত্র ঋষিগণেরই খুলিয়াছিল। তাঁহারাই জানিতে পারেন যে কোন্ দেহ অবলম্বনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন অথবা কোন্ দেহ আশ্রয় করিয়া কে কার্য্য করিতেছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে কৈবল্যপাদের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সূত্র ও ভাষ্যে উল্লিখিত আছে যে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের এইরূপ শক্তি আছে যে বিভিন্ন প্রকার চিত্ত নির্ম্মান করিয়া একই কালে তাঁহারা বিভিন্ন দেহ অবলম্বন করিতে পারেন এবং বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য তত্তৎ দেহনিষ্ঠ চিত্তের দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। সেই সকল বিভিন্ন চিত্তে তাঁহাদের সম্যক্ শক্তি প্রকাশিত হয় না। সুতরাং কেবল বাহ্যিক কার্য্যদৃষ্টে অবতারত্ব কাহারও স্থির করা যায় না এবং অবতার হইলেই যে অভ্রান্ত সত্যদর্শী হইবেন ইহারও কোন স্থিরতা নাই।

কোন কোন সময়ে জনসমাজের অবস্থা দৃষ্টে ভগবদবতারের আবির্ভাব বহুলোকের মনে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিকশক্তি সম্পন্ন কাহাকে দেখিলেই উক্তপ্রকার ভাবাক্রান্ত অনেক লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আরও কিছু শক্ত্যাধিক্যের পরিচয় পাইলেই তাঁহারা আপন ইচ্ছানুরূপ অবতার আসিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া লয়েন। যাঁহারা এইরূপ স্বভাবতঃ শক্তিশালী হয়েন তাঁহাদেরও মনে কখন কখন এইরূপ ভ্রম জন্মিয়া থাকে যে তাঁহারা স্বয়ং অবতার। যাঁহারা উচ্চ সাধক তাঁহাদের উপাস্যের সহিত অভেদ বুদ্ধিও সময় সময় সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত অত্যুৎসাহ বশতঃ

তাঁহারাও আপনাদিগকে সেই ইষ্টেরই অবতার বলিয়া নিজে মনে করেন এবং অপরের নিকট প্রকাশিত করেন। আধুনিক কালে যথার্থ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণের প্রকাশ বিরল হওয়ায় বহুবিধ অবতার এইরূপে কল্পিত হইয়া বহুবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অথবা মহেশ্বরের অবতার কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া এই কারণে অসম্ভব হইয়াছে।

(গুরু শিষ্য সংবাদ পৃঃ ২৫১)

গুরু সমাশ্রয়ণের অত্যাবশ্যকতা

………এই ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন উপজাত হয় না। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তির সহিত ভজন করিলে ব্রহ্ম সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন। (গুরু-শিষ্য-সংবাদ পৃঃ ১৯৬)

………শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সময় সময় বলিতেন,—

"কর সদ্‌গুরু কি আশ
হোয় ঘট্‌মে প্রকাশ
হোয় তিমির কি নাশ"।

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মহারাজ! সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা কি জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না? অনেকে ভগবানের নাম গ্রন্থাদি হইতে শিক্ষা করিয়া অনেক প্রকার সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতে কি কিছু ফল হয় না?"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "বাবা! ভগবানের নাম সাধনে অনেক ফল হয়, খুব নিষ্ঠা পূর্ব্বক করিতে করিতে অনেক প্রকার সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সাধন ইহা দ্বারা হয় না, কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে; তদ্ভিন্ন জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না।"

(শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন চরিত পৃঃ ১৫৮)

৩

ভগবদ্গীতার এই উপক্রমণিকা সন্তদাসজী মহারাজের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। এ জিনিস লেখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব তিনি গীতার গুহ্যতম তত্ত্ব স্বয়ং সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে নিঃশেষে আত্মসাৎ করেছেন। সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এই ভাগবদ্গীতা, আর এই ভাগবদ্গীতার সার এই আশ্চর্য উপক্রমণিকা।

লক্ষ্য করতে হবে, সন্তদাসজী গীতোক্ত কর্মযোগের দুটি ভূমির উল্লেখ করেছেন। সকাম বিহিত কর্মানুষ্ঠানের (যথা, বৈদিক যাগযজ্ঞ) পর যথার্থ (নিষ্কাম) কর্মযোগের আরম্ভ। নিষ্কাম কর্মযোগের অর্থ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত বিহিত কর্মানুষ্ঠান। এ হল কর্মযোগের প্রথম ভূমি। এ অবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকলেও কতৃ ত্ববোধ থাকে। কর্মযোগের দ্বিতীয় ভূমিতে এই অহংকর্তৃত্ববোধ বিলুপ্ত হয়। এটাই হল কর্মযোগের সম্যক্ সিদ্ধি বা "নিষ্কর্ম্যসিদ্ধি"। এই অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ সম্যক্ দূরীভূত হয় এবং একাগ্রতা জন্মে; তখনই প্রকৃত যোগের আরম্ভ।

এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতেই কর্মযোগের পর্যবসান ; এর পর আর কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না ; সাধক তখন কর্মসন্ন্যাস করে ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করেন। তারপর যে সব অবস্থা ক্রমশঃ লব্ধ হয় তা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ থেকে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। গীতার শ্লোকগুলি সন্তদাসজী তাঁর অনেক গ্রন্থেই উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাত্ম-সাধনার অরোহ-ক্রম বোঝাতে গিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় এই পাঁচটি শ্লোকের মধ্যে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার মূল ধারা এবং চরম তত্ত্বটি নিহিত।

সর্ববিধ সাধনার সাক্ষাৎ-লভ্য শেষ ফল—কার্য-ব্রহ্ম বা হিরন্যগর্ভপ্রাপ্তি। এই "ব্রহ্মভূত" অবস্থার লক্ষণ হল চিত্তের সাত্ত্বিক প্রসাদ ও সমদর্শন। সাধনা অর্থাৎ সাধকের প্রযত্ন এখানেই শেষ। তারপর পরব্রহ্মের প্রতি পরাভক্তি স্বতঃই উপজাত হয় ; এই পরাভক্তিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরব্রহ্ম-প্রাপক।

"যোগ" সম্বন্ধে সন্তদাসজী যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যাবে, এই গীতোক্ত ক্রম এবং পাতঞ্জলোক্ত সাধন-ক্রমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান; পাতঞ্জল ও গীতার মধ্যে এই প্রতিষঙ্গ বা correspondence আবিষ্কার এই উপক্রমণিকাটির একটি অপূর্ব বস্তু, একথা "ব্রহ্মর্ষি সন্তদাস" প্রবন্ধে পূর্বেই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছি।

গীতোক্ত সাধন-ক্রম

১। সকাম ব্যক্তি সর্বদা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিবেন।

২। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত অপেক্ষাকৃত শুদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। তখন তিনি অনাসক্তভাবে (কর্মের ফলের প্রতি ও কর্মের প্রতি আসক্তিহীন হইয়া) কর্তব্য বুদ্ধিতে (শাস্ত্রমুখে

প্রকাশিত ভগবদাদেশ পালন করা কর্তব্য, তিনি তদ্দ্বারা প্রসন্ন হইবেন এইমাত্র বুদ্ধিতে) অনহংকৃত ভাবে (কর্ম জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বর প্রেরিত এইরূপ বুদ্ধিতে) বিহিত কর্মসকল অনুষ্ঠান করিতে যত্ন করিবেন। এইরূপ কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলে।

৩। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা কর্মযোগে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে যোগ-মার্গে আরূঢ় হইয়া বিহিত কর্মের সন্ন্যাস করিয়া নির্জন-স্থানবাসী হওয়তঃ ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হইবেন।

৪। এইরূপ ধ্যানের ফলে নিজে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন ("ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে")।

এইরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগসিদ্ধ হইলে তৎপর তাঁহার ধ্যানাদি কর্মও বিলুপ্ত হয়, এবং তৎপরে তাঁহার যে সকল অবস্থা ক্রমশঃ লব্ধ হয় তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক সকলে বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।।১৮।৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।।১৮।৫৫

অস্যার্থ :—(ভগবান্ বলিতেছেন) এইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই পুরুষের চিত্ত সর্বদা প্রসন্নভাব অবলম্বন করে, কোন শোক করিবার বিষয় তাঁহার থাকে না, তাঁহার সর্ববিধ ভোগ-কামনা দূরীভূত হয়, তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হয়েন। এইরূপ হইয়া তিনি মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন, এবং সেই পরাভক্তির

দ্বারা তত্ত্বের সহিত আমার স্বরূপ অবগত হইয়া (পরব্রহ্মস্বরূপ) আমাতে প্রবেশ লাভ করেন।১৮।৫৪-৫৫

পরাভক্তি ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার

ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকে দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা :—সাধনভক্তি ও পরাভক্তি। সাধনভক্তিতে ভগবৎ উপাসনা, ধারণা, ধ্যান ইত্যাদি কর্ম বর্তমান থাকে। ভগবানের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণই ভক্তির লক্ষণ। সাধনভক্তিতে ঐ প্রীতি ও আকর্ষণের মাত্রা অল্প থাকে। ইহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান ঐ ধ্যানের দ্বারা যে পরিমাণে দূর হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তৎপ্রতি প্রীতি ও আকর্ষণেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অবশেষে ধ্যানের দূরতা হেতু যখন ধ্যাতার আত্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, তখন ধ্যেয় ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পৃথগ্‌রূপে অস্তিত্ব-বিষয়ক জ্ঞান একেবারে বিরহিত হইয়া যায়। কিন্তু ধ্যানকার্য্য বুদ্ধির দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যে চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ঐ ধ্যান তাঁহারই ধ্যান। কারণ বুদ্ধি নিজের স্বরূপকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত যে পুরুষ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা হয়। "ব্রহ্ম" শব্দ শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, পরব্রহ্ম এবং কার্য্যব্রহ্ম (তদ্ভিন্ন "ব্রহ্ম" শব্দ বেদকেও বুঝায়)। বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত অবস্থাতেই পরব্রহ্মকে "কার্য্যব্রহ্ম" বলা যায়, ইঁহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্ঞান সত্ত্বগুণাত্মক, ইহা বুদ্ধিরই

স্বরূপ, অতএব বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের (হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মের) সহিত পূর্বোল্লিখিতরূপে অভিন্নভাবে যে স্থিতি তাহাই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। ইহার উপর আর জ্ঞানের অধিকার নাই। ইহাই জ্ঞানসাধনের শেষ। অতএব ১৮শ অধ্যায়ের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই জ্ঞানের সমাপ্তি (পর্যবসান) "নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" —বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের জ্ঞানের অবস্থা এই যে সেই পুরুষ পরমাত্মাকে বুদ্ধি আদি প্রকৃতিবর্গের অতীত বলিয়া অনুভব করেন। সাংখ্যমার্গাবলম্বী সাধকের সম্বন্ধে এই জ্ঞানকে পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব "সত্ত্বান্যতাখ্যাতি-মাত্রম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ সত্ত্বগুণ হইতে আত্মা পৃথক্ বলিয়া সেই পুরুষ জ্ঞাত হয়েন। কিন্তু সেই পৃথগ্রূপটি কীদৃশ এই তত্ত্বের স্ফুরণ তখনও তাঁহার হয় না।

পূর্বোক্ত ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এবং ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের "ব্রহ্মভূতঃ" পদে যে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার যে পরব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ হয় নাই—কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে তাহা ঐ ৫৪ শ্লোকের শেষাংশে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" বাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপেই বোধগম্য হয়। যদি "ব্রহ্মভূত" পদোক্ত ব্রহ্ম পরব্রহ্ম হইতেন, তবে তদাত্মতা প্রাপ্তির পর সাধকের আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকিত না। কিন্তু ঐ ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্ত পুরুষ ভগবৎ-সম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন এবং ঐ পরাভক্তি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা তত্ত্বের সহিত ভগবৎস্বরূপ পশ্চাৎ অবগত হয়েন বলিয়া পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ৫৩।৫৪ শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম পরব্রহ্ম হইতে পারেন

না, সুতরাং জ্ঞানসাধনের শেষ ফল হিরণ্যগর্ভ (কার্য্যব্রহ্ম) প্রাপ্তি, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি নহে। হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইলে পরব্রহ্ম-সম্বন্ধিনী যে পরাভক্তি উপজাত হয় সেই পরাভক্তি পরে পরব্রহ্ম স্বরূপের জ্ঞাপক হয়। এই ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। কারন জ্ঞান সত্ত্বগুণাত্মক। তাহা সত্ত্বগুণের স্বরূপ বর্ণনায় বহুস্থলে ভগবান্ গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। গুণকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরাভক্তিই একমাত্র উপায়। —(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকা পৃঃ ৫৪—৫৬)

*　　*　　*　　*

বাস্তবিক লোকতঃও দৃষ্ট হয় যে কোন এক পুরুষের সম্বন্ধে অতি মহৎ বলিয়া যখন ধারণা জন্মে, তখন স্বভাবতঃই তৎপ্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ভাব আপনা হইতে অন্তরে উদিত হয়। মহৎ বলিয়া ধারনা জন্মে অথচ ঐ মহতের প্রতি ভক্তির উদয় হয় না এমন কদাপি দৃষ্ট হয় না। যেখানে মহতের প্রতি ভক্তির উদয় না হয়, সেখানে মহৎ বলিয়া বোধই জন্মে নাই—কোন ব্যক্তি মহৎ এইরূপ কথা শুনিয়া তাহা মুখস্থ করা হইয়াছে মাত্র বুঝিতে হয়; বাস্তবিক তাঁহার মহত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। লোকতঃই যখন এইরূপ দৃষ্ট হয় তখন এই অপরিসীম জগতের পরিচালক, নিয়ন্তা এবং ইহার সৃষ্টি ও পালনকর্তার মহত্ত্ব বোধ হইলে, তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার না হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যে স্থলে তাহা হয় না, বুঝিতে হইবে যে

সেই স্থলে জগতের সৃষ্টি ও পালন বিষয়ে যে জ্ঞান ও শক্তির আবশ্যক তাহার ধারণা যথার্থরূপে হয় নাই—ইহার সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তার মহত্ত্বের বোধ প্রকৃতপক্ষে জন্মে নাই।

অতএব ভগবান্ বলিয়াছেন যে প্রকৃতি ও পুরুষ যাঁহার অংশ-মাত্র, যিনি স্বরূপতঃ এই উভয়ের অতীত থাকিয়াও উভয়ে ব্যাপ্ত আছেন, যিনি আপনার মধ্যে এতদুভয়কে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পরাভক্তিই একমাত্র উপায়। আত্মা-নাত্মবিবেক, (প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য-বিষয়ক জ্ঞান-সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতি) যাহাতে জ্ঞানবৃত্তির পরিসমাপ্তি হয় তাহা (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) ইহার উপায় নহে। কৈবল্যলাভার্থী পুরুষ এই সত্ত্বপুরু-ষান্যতাখ্যাতিরূপ চিত্তবৃত্তিকেও নিরুদ্ধ করিলে তৎপরে কৈবল্য উপস্থিত হয় বলিয়া যোগসূত্রকারও বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ অবস্থা লব্ধ হইলেই পরাভক্তি চিত্তকে অধিকার করে। তাহা সাধকের কোন চেষ্টাসাপেক্ষ নহে। তবে জ্ঞানসাধনের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। তাহা যে সময়ে, যে অবস্থায় এবং যেরূপ আচরিত হওয়া উচিত তাহাও গীতাশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; এবং যেরূপে আচরিত হওয়া উচিত তাহাও গীতাশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহার ফল যে কার্যব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি তাহাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা পর-ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাক্ষ্য সম্বন্ধে উপায় নহে; পরম্পরাসূত্রে মাত্র উপায়।

এই পরাভক্তির উদয় হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্বক তত্ত্বের সহিত আত্মস্বরূপ ভক্তের নিকট প্রকাশিত করেন। অতএব ১৮শ অধ্যায়ের

পূর্বোদ্ধৃত ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম অর্ধভাগে ভগবান্ বলিয়াছেন যে পরাভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর উপজাত হইলে—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।'

অর্থাৎ ঐ পরাভক্তির দ্বারা ভগবান্ যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন এবং যৎস্বরূপ তাহা তত্ত্বের সহিত ভক্ত অবগত হয়েন।

পরন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন : 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অতএব পূর্বোক্ত 'মামাভিজানাতি' বাক্যে যে 'জানাতি' পদ আছে, তাহা সত্ত্বগুণের বৃত্তিরূপ পূর্বোক্ত কার্য্যব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে। জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম গুণাতীত, সুতরাং তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞানলাভ নহে। অতএব শ্রুতি বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া, আর পরব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে (ব্রহ্মভাবে) স্থিত হওয়া একই কথা। ইহাকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বলে। অতঃপর দেহপাত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ রহিত হইলে, পরে সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তাবস্থা লব্ধ হয়। —(শ্রীমদ্ভাগবদগীতার উপক্রমণিকা পৃঃ ৫৯—৬২)

যোগ

'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ সমাধি। যখন সাধক ধ্যানকার্য্যে এমন নিবিষ্ট হন যে তাঁহার চিত্ত কেবল ধ্যেয়বস্তুর আকারে পরিণত হয়, তিনি যে ধ্যান করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যান, নিজের সম্বন্ধেও স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। আর বাহ্য বিষয়ের ধারণা হইতে আভ্যন্তরাভিমুখে

আকৃষ্ট হইয়া চিত্ত যখন একেবারে বাহ্যবৃত্তি-বিরহিত হয়, কোন ধ্যেয় বস্তু চিত্তে উপস্থিত থাকে না, জ্ঞানের বিষয়রূপে কিছু ভাসমান হয় না, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিক হইয়া স্বীয় স্বরূপমাত্রে অবস্থিতি করে, তখন চিত্তের সেই অবস্থাই যোগের সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞানের বিষয়রূপে কিছুই বর্তমান না থাকাতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই অবস্থায় চিত্ত স্বরূপগত নির্মল সাত্ত্বিক আনন্দে অবস্থিতি করে।

পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই নিয়ত আপন আপন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে। বিষয় সকল উপস্থিত না থাকিলেও কল্পনাতে বিষয় সকল উদিত হইয়া তৎপ্রতি ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং ঐ বিষয় সকলের ভোগবাসনার সংস্কারসকলকে দূরীভূত করিতেছে। পরন্তু ভোগ্য বিষয় সকলের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের এই বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে যোগ অবলম্বন করা অসম্ভব; কারণ, চিত্তের বিক্ষেপ থাকিতে কোন এক বিশেষ ধ্যেয়বস্তুর প্রতি চিত্ত দীর্ঘকাল লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। অতএব, যিনি যোগাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করা আবশ্যক। কিন্তু বিষয় সকলের ভোগবাসনা যে পর্যন্ত থাকিবে, সেই পর্যন্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করা অসম্ভব হইবে। ভোগসংস্কার সকল যে পরিমাণে সবল থাকে, সেই পরিমাণেই মন তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তৎপ্রতি সমস্ত ইন্দ্রিয় ধাবিত হইতে থাকে। অতএব, ইহা জানিয়া যোগলাভেচ্ছু পুরুষ প্রথমেই ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিতে যত্ন করিবেন, এবং ইন্দ্রিয় সকলের

প্রেরক ভোগবিষয়ক সংস্কার সকলকে পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪

"ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" বস্তুতঃ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ "দার্শনিক" ব্রহ্মবিদ্যার ভূমিকাস্বরূপ। প্রথম খণ্ডে ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র এবং সাংখ্যকারিকা) আলোচিত হয়েছে—প্রথম তিনটি আংশিকভাবে এবং সাংখ্য সম্পূর্ণভাবে। পূর্বমীমাংসা দর্শনের ভূমিকায় শব্দ এবং অর্থের নিগূঢ় সম্পর্ক, মন্ত্রতত্ত্ব এবং সংস্কৃত ভাষার পরোৎকর্ষ গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে; এই অংশটি জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেরই নিবিষ্টচিত্তে অধ্যেতব্য।

দ্বিতীয়খণ্ডে পাতঞ্জল যোগসূত্র ব্যসভাষ্যসহ বাংলাভাষায় অনূদিত এবং স্থানে স্থানে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা অতি উপাদেয়; তবে পৌর্বাপর্য থেকে পরিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি-সম্যক্ বোধগম্য হওয়া কঠিন বিবেচনায় কিছু উদ্ধৃত হল না; কেবল পাতঞ্জল দর্শনকে সন্তদাসজী কি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করেছি। আর একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করতে হবে: যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যকে তিনি মূলসূত্রেরই তুল্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং একথাটাও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে এই "অপূর্ব ভাষ্যের রচয়িতা স্বয়ং ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ভগবান্ ব্যাসদেব। কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এই কারণে যে আধুনিক পণ্ডিতেরা, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, এ কথা স্বীকার করেন না।

তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে নিম্বার্কভাষ্যসমেত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। সন্তদাসজীর গ্রন্থরাজির মধ্যে এইটি বৃহত্তম। বাংলাভাষায় নিম্বার্কচার্যবিরচিত

এই অতি প্রাচীন, প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ বেদান্তভাষ্য এই প্রথম প্রকাশিত হল। এই "বেদান্তদর্শন"এর ভূমিকা এবং (পরবর্তীকালে রচিত এবং সংযোজিত) উপসংহার বৈদান্তিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

"উপসংহার" থেকে আহৃত অংশে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে সম্পর্কটি তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা অভাবিতপূর্ব; ঠিক এভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং ঐক্য প্রদর্শন আর কেউ পূর্বে বা পরে করেছেন কিনা সন্দেহ। বাস্তবিক জিনিসটাকে এইভাবে বিচার করলেই উভয়ের মধ্যে আর কোন বিরোধই থাকে না, কারণ সাংখ্যভাবনা তখন পূর্ণ, অখণ্ড বেদান্তদর্শনের অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

পরন্তু জীবনধারণ করিতে হইলে তদুপযোগী কর্মও সর্বদা করিতে হয়, আহারাদি কোন কার্য্যই একদা পরিত্যাগ করা যায় না। তদ্দ্বারা ভোগ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে; সুতরাং ভোগসংস্কারও আপনা হইতেই সর্বদা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, ভোগদায়ক কর্ম যখন পরিহার্য্য নহে, তখন ভোগ বর্তমান থাকিলেও এই সকল সংস্কার যাহাতে উৎপন্ন হইয়া ভোগবাসনা বর্ধিত করিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। নতুবা ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইবে না এবং সমাধিও লাভ করা যাইবে না।........

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় .... এইরূপ উপায়ই নির্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ কর্মযোগ উপদেশ করিয়াছেন। এই কর্মযোগের দুইটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া অনাসক্তভাবে কেবল শাস্ত্রে প্রকাশিত ভগবদাদেশ প্রতিপালন পূর্বক তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম করা। এইরূপ কর্ম করিতে করিতে সাধকের বিষয়ভোগলিপ্সা বিদূরিত হয়। ইন্দ্রিয়ের ভোগার্থে আর তাঁহার কর্মে প্রবৃত্তি হয় না।

সুতরাং কর্মের আনুষঙ্গিকরূপে ভোগসকল হইয়া গেলেও তদ্বিষয়ে ভোগ-সংস্কার জন্মিতে পারে না। এইরূপে ভোগ-সংস্কার শিথিল হইলে ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইয়া পড়ে। যে ভোগবাসনার সংস্কার ইন্দ্রিয়সকলকে ভোগ বিষয়ে প্রেরিত করে, সেই সকল সংস্কার শিথিল হইয়া যাওয়াতে ইন্দ্রিয়সকলের স্বভাবসিদ্ধ বহির্মুখীন বেগ প্রশমিত হয়। সুতরাং চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া যায়, সমাধির নিমিত্ত চিত্ত প্রস্তুত হয়।

চিত্তের এইরূপ শুদ্ধি উপজাত হইলে সাধক ইহাও বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরই মূলতঃ চিত্তের সমস্ত বৃত্তির প্রেরক। কর্মশক্তিও তাঁহার নিজের অধীন নহে, ঐ শক্তির উদ্ভব এবং তিরোভাব বিষয়ে তাঁহার কোন কতৃত্ব নাই ; ঈশ্বরই ইহারও প্রেরক। সুতরাং এই প্রকার বোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম বিষয়ে তাঁহার নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। কর্মকে উপলক্ষ্য করিয়াই তৎকর্তৃরূপে অহংবুদ্ধি প্রতিষ্ঠালাভ করে। সুতরাং কর্মে ঈশ্বরকর্তৃত্ববুদ্ধি স্থাপিত হইতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে অহংবুদ্ধিরও বিলুপ্তি ঘটিয়া চিত্তের প্রসারণ হইতে আরম্ভ হয়। তখন কর্মসকল করিয়াও সাধক মনে করেন তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না। ঐশীশক্তি ইন্দ্রিয়সকলকে পরিচালিত করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে ; তিনি নিজে অকর্তা। এইরূপ স্বকর্তৃত্ববুদ্ধি-বিরহিত হইয়া কর্ম করাই কর্মযোগের দ্বিতীয় অবস্থা এই অবস্থায় প্রতিভালাভ করিলে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবার হেতু আর কিছু থাকে না। তখনই সাধক পূর্বোক্ত যোগ সমাধি অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন ; এবং তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা

যায়। তৎপূর্বে তিনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক কর্মযোগী বলিয়া অভিহিত হয়েন। যোগে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ তিনি সর্ববৃত্তির নিরোধরূপ, স্বীয় আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ যোগের শেষ অবস্থা লাভ করেন। তৎপরে পরাভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন।

—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপক্রমণিকা—পৃঃ ৬৭-৭০)

পাতঞ্জল দর্শন ও ব্যাস-ভাষ্য

এই পাতঞ্জল দর্শন সম্যক্ আয়ত্ত হইলে, ভারতীয় সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্রে ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী-বিষয়ে চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়।····এই পাতঞ্জল দর্শন সমস্ত আর্যশাস্ত্রের প্রতি সাধকের দৃষ্টি উদ্ঘাটিত করিবে।····এই গ্রন্থ সাধকমাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপাদেয়। —("পাতঞ্জল দর্শন"—উপক্রমণিকা, পৃঃ ১-২)

*　　　*　　　*　　　*

যোগাবলম্বি সাধকদিগের পক্ষে পাতঞ্জল দর্শন অতি উপাদেয়; মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তৎকৃত ভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই ভাষ্য স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হওয়াতে ইহা মূলগ্রন্থের ন্যায় আদরনীয়। যোগসূত্রের এই ভাষ্য অতি গভীর মীমাংসাপূর্ণ গ্রন্থ; ইহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিলে অধিকাংশ হিন্দুধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্মসকল সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।—(ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, পৃঃ ৩০)

বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ

সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও পাতঞ্জলদর্শনে)

ব্রহ্মের পূর্বোক্ত চতুর্বিধ রূপের (জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর ব্রহ্ম) মধ্যে জীব ও জগদ্রূপেরই বিশেষ বিচার প্রবর্তিত করা হইয়াছে। এই রূপদ্বয়ই যে অনাদি, তাহা বেদান্তদর্শনেরও স্বীকার্য। জগৎ হইতে যে জীব বিভিন্ন, তাহা অতি বিস্তৃত বিচারের দ্বারা সাংখ্যদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ; জীবকে দৃক্‌শক্তি (চিতিশক্তি) ও জগৎকে দৃশ্য (অচেতন) শক্তি এবং গুণাত্মক বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধেও বেদান্তদর্শনের সহিত কোন বিরোধ নাই। প্রকাশিত জগতে ব্রহ্মের জীবরূপ যে জগদ্রূপ হইতে বিভিন্ন, তাহা বেদান্তদর্শনেরও সম্মত। অতঃপর সাংখ্যশাস্ত্রে এই উপদেশ করা হইয়াছে যে "নেতি" "নেতি" বিচারের দ্বারা জীব আপনাকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জানিয়া এবং আপনাকে স্বরূপতঃ গুণাতীত মুক্তস্বভাব বোধ করিয়া, ঐ গুণাতীত স্বীয় স্বরূপের চিন্তা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। বেদান্তদর্শনের শিক্ষার সহিত সাংখ্য-শাস্ত্রের এই উপদেশেরও কোন বিরোধ নাই, মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধক যে আপনাকে স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ মুক্তস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিবেন, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের ৩।৩।৫২ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন ; এবং প্রথমাধ্যায়ের প্রথম-পাদের শেষ সূত্রে যে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতেও এইরূপ চিন্তার আবশ্যকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে জীবাত্মাকে বিভুস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; তাহার ফল এই যে, সাংখ্যমার্গীয় সাধক আপনাকে জগদতীত শুদ্ধ বিভু আত্মা বলিয়া চিন্তা করেন। বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই

বিভুত্বের উপদেশ করা হইয়াছে ; অতএব সাংখ্যমার্গীয় সাধন বেদান্ত-দর্শনোক্ত "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনার অঙ্গীভূত। "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনায় "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা ব্রহ্মকে গুণাতীত, নিষ্ক্রিয় ও বিভুস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং সাধক আপনাকেও তাঁহার অংশমাত্র জানিয়া ঐ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করেন ; সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী বেদান্তোক্ত অক্ষরব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। এই অর্থে সাংখ্যমার্গের উপাসনা-বিষয়ক উপদেশ বিষয়েও বেদান্তদর্শনের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রদ উপাসনার মধ্যে ইহা একাঙ্গবিশেষ।

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও জীবশক্তিকে নিত্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ; এবং জীব যে অনন্ত তাহাও বেদান্তদর্শনেরও অস্বীকার্য নহে, জীবকে "অণু"-স্বভাব এবং ব্রহ্মকে "বিভু"-স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে জীবের অসংখ্যেয়ত্ব বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য ; এই অংশেও সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্ত-দর্শনের বিরোধ নাই।

ঈশ্বর যে জীব হইতে বিভিন্ন, এবং তাঁহাকে যে "সর্বজ্ঞ" ও "পুরুষবিশেষ" বলিয়া পাতঞ্জলদর্শনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বেদান্তদর্শনের অস্বীকার্য নহে ; কারণ ঐশীশক্তিকে জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া শ্রুতি এবং বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রেও "স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা", "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" ইত্যাদি সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই অংশেও উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

কিন্তু বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহার উপদেশ সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে অধিক ব্যাপক।.... জীবশক্তি এবং জগৎশক্তিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াও এতদুভয়ের ব্রহ্মরূপে একত্ব বেদান্তদর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীবসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সুতরাং বহু হইলেও যে ইঁহারা সকলেই এক ব্রহ্মেরই অংশমাত্র এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহাও বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন একদেশদর্শী হওয়ায়—ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার উপদেশের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সাংখ্যশাস্ত্রে স্বভাবতঃই "গর্ভদাসবৎ" ঈশ্বরের অধীন ও জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অকর্তা এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত নিত্যসান্নিধ্যসম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; ইহা ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ; সুতরাং ব্রহ্মই জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।....কিন্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব থাকিলেও তিনি যে অক্ষররূপে অকর্তা এবং গুণাতীত শুদ্ধস্বভাব, তাহা বেদান্তও উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নিবিষ্ঠ হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উভয় দর্শনের মধ্যে যেরূপ বিরোধ থাকা কল্পনা করা হয়, তাহা প্রকৃত নহে। এইরূপ পরমাণুকারণবাদের সহিতও প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই। কারণ, স্থূলপঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যসমস্ত যে পরমাণুসকলের পঞ্চীকরণের দ্বারা গঠিত, তাহা বেদান্তদর্শনের অসম্মত নহে। তবে ঈশ্বর পরমাণুরও প্রকাশক এবং নিয়ন্তা; সুতরাং

একমাত্র মূলকারণ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরমাণুকারণবাদের বিরোধী নহে।....এইরূপে সকল দর্শনই বেদান্তে সমন্বিত হয়।

—("বেদান্তদর্শন"-উপসংহার, পৃঃ ৬২০-২৩)

দর্শনশাস্ত্র-পাঠ

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আপন আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে সদ্‌গুরুর নিকট সাধন অবলম্বন করিয়া, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। তদ্রূপ করিলেই দর্শনশাস্ত্রপাঠ সফল হয়, এবং দর্শন-শাস্ত্রের উল্লিখিত উপদেশ সকল স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। অপর সাহিত্যের ন্যায় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলে, কেবল মতামতবিচারেরই দক্ষতা জন্মে এবং তার্কিকতার বৃদ্ধি হয়; তদ্দ্বারা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বেদান্তদশনে যে ব্রহ্মস্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জীবের পাপ-তাপ মোচনের নিমিত্ত এবং জিজ্ঞাসু সাধককে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে; তাঁহার স্বীয় পাণ্ডিত্য জগতে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নহে। সর্বাশ্রয় সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মই যে জীবের গন্তব্য, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তিনিই যে জীবের পাপতাপহারী এবং আনন্দদাতা, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া, জীব যাহাতে আপনার সুগতির নিমিত্ত তাঁহার শরণাপন্ন হয়, এবং সর্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ভজন ও চিন্তনে অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে বুদ্ধিকে প্রেরণা করাই পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের

অভিপ্রায়। এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে, দর্শনশাস্ত্র পাঠে কেবল তার্কিকতারই পুষ্টিসাধন হয়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না। অতএব যাঁহারা আপন কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুর অনুগত হইয়া দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন; ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা। ব্রহ্মবিদ্যালাভের নিমিত্ত যে ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, তাহা জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সর্বকালে সর্ববিধ আর্যশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

—("বেদান্তদর্শন"-উপসংহার, পৃঃ ৬২৪-২৫)

ভক্তিযোগ ও বেদান্ত

সর্বরূপী ও অরূপী, সর্বরূপময় ও সর্বরূপাতীত, প্রাকৃতিক-গুণাতীত অথচ সর্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয়, এই ব্রহ্মকে ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়; ভক্তিই এই পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণসাধন (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। আপনাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, ভক্তিমার্গের অঙ্গীভূত। জ্ঞানমার্গের সাধক কেবল আপ-নাকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন এবং জগৎকে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন। ভক্তিমার্গের সাধকের নিকট অনাত্ম বলিয়া কিছুই নাই; তিনি আপনাকে যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করেন, তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করেন, এবং ব্রহ্মকে জীব ও জগদতীত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ অচ্যুত-আনন্দময় বলিয়াও চিন্তা করেন।

এই ভক্তিমার্গের উপাসনাকে কেবল সগুণ উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে। ভক্তিমার্গের উপাসনা ত্রিবিধ অঙ্গে পূর্ণ : জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ইহার একটি অঙ্গ ; জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ইহার দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং জীব ও জগৎ হইতে অতীত, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ সর্বাশ্রয় ও আনন্দময় রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ইহার তৃতীয় অঙ্গ। উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয় ; তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই ; জাগতিক কোন বস্তুই কেবল গুণাত্মক নহে ; ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ অবস্থিতি করিতে পারে না ; কারণ গুণের স্বাতন্ত্র্য বেদান্তশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভক্তসাধক যে কোন মূর্তি দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া তৎপ্রতি স্বভাবতঃ প্রেমযুক্ত হয়েন। এইরূপে সর্ববিধ দ্বৈতধারণা ও অসূয়া-বিবর্জিত হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে, পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়, ইহাই পরাভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহারই দ্বারা পরব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্রহ্মসূত্রেও বেদব্যাস এই ত্রিবিধ উপাসনাই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩২)।

—("বেদান্তদর্শন"-ভূমিকা, পৃঃ ৪৩-৪৪)

৫

অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। গুরু-শিষ্য-সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সন্তদাসজী মহারাজের বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। গোস্বামী মহাশয়ের উত্তেজনা এবং উষ্মার কারণ ছিল প্রধানতঃ এই দুটি : "মুক্তি"ই পরম পুরুষার্থ এবং শ্রীকৃষ্ণদেহ "প্রাকৃত"—এই দুটি নাস্তিকোচিত, বৈষ্ণবধিক্কৃত

সিদ্ধান্ত প্রচার। "মুক্তি"কে যাঁরা পরম পুরুষার্থ বলেন, গোস্বামী মহাশয়ের মতে তাঁদের শ্রীমদ্‌ভগবতপাঠে অধিকারই নেই; আর শ্রীকৃষ্ণের দেহ "প্রাকৃত", একথা, "উন্মত্তের প্রলাপ বচন।"

এই ক্রুদ্ধ, অশালীন আক্রমণের উত্তরে শ্রীযুক্ত সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে (গুরু-শিষ্য-সংবাদ ও এঁর নামেই প্রকাশ করা হয়) এই পুস্তকাটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজন হলে যে সন্তদাসজী মহারাজ রণদুর্মদ আচার্য শঙ্করের মতই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারতেন প্রতিপক্ষকে শাণিত যুক্তিবাণে বিধ্বস্ত করে, এই পুস্তিকাটি তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। বলবার ভঙ্গি শান্ত, অনুত্তেজিত, ঈষৎস্মিত, বিচার অখণ্ডনীয়, এবং irony অননুকরণীয়।

১। এখানে লক্ষণীয় স্বয়ং ভক্তাগ্রগণ্য বৈষ্ণবাচার্য হয়েও সন্তদাসজী মুক্তি বা মোক্ষকেই জীবের পরমাগতি বলেছেন। ভক্তি মুক্তির চেয়েও বড় একথাটা তাঁর মতে ভক্তির প্রশংসাপর অর্থবাদ বাক্য মাত্র। ভক্তি গাঢ়তর হলে ভক্ত মুক্তিও কামনা করেন না, একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু এর দ্বারা মুক্তির হেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না, বরং এটাই প্রমাণ হয় যে ভক্তি মুক্তিরই সাধন বা উপায়, উপায় কখনো লক্ষ্যের চেয়ে বড় হতে পারে না।

২। ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেও অবতার শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আর স্বরূপতঃ চিদানন্দময় পরব্রহ্মের দর্শন এক নয়, অনেক তফাৎ। প্রথমরূপটি প্রাকৃত, অতএব প্রাকৃতনেত্রগ্রাহ্য; দ্বিতীয়টি অপ্রাকৃত, অমূর্ত, অবাঙ্‌মনসোগোচর অতএব সেই দর্শন এই চোখ দিয়ে দেখা নয়, জ্ঞাননেত্রের দ্বারা চিন্ময়রূপে দর্শন।

৩। অবতারোপাসনার অন্তর্নিহিত চতুর্বিধ ভাব বা aspect বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উপাসনার এই নিগূঢ় তত্ত্ব ঠিক এভাবে, এত পরিষ্কার করে অন্যত্র বলা হয় নি, তাই উদ্ধৃত হয়েছে।

বিগ্রহোপাসনা ও বেদান্ত

তবে দ্বৈতবুদ্ধিতে কোন বিশেষ মূর্তিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মোক্ষদাতৃত্বের অভাব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকল নিবিষ্টচিত্তে পর্যালোচনা করিলেই তাহা উপপন্ন হইবে ; এবং শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও তাহাই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।...দ্বৈতভাবে ভগবদ্বিগ্রহের ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ না হইলেও তাহা চিত্তের নির্মলতা সাধন করিয়া জ্ঞানযোগাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অদ্বৈতজ্ঞান উৎপাদন করে, এই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরাভক্তির আপনা হইতে উদয় হয়, এবং সাধক অবশেষে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। আত্মানাত্মবিচার-প্রধান জ্ঞানযোগদ্বারাও মোক্ষ সাধিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই ; পরন্তু এই প্রণালীর সাধন অতি কঠিন ; তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়েও বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু কেবল জ্ঞানযোগই যে মোক্ষলাভের উপায়, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। বেদব্যাস পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে জ্ঞানযোগ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু স্বরচিত বেদান্তদর্শনে তিনি ভক্তিযোগকেই প্রশস্ত সাধনোপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাতঞ্জল ভাষ্যেও "ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যানে ভক্তিযোগ যে অতিশীঘ্র ফলোৎপাদন করে, তাহা ভাষ্যকার বর্ণনা করিয়াছেন ; পরন্তু পাতঞ্জলদর্শন প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গীয় গ্রন্থ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানযোগেরই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন জ্ঞানযোগীদের উপাদেয় ; ব্রহ্মসূত্র ভক্তিমান্ যোগিসকলের বিশেষ উপাদেয়।

—('বেদান্তদর্শন'-ভূমিকা, পৃঃ ৪৫-৪৬)

* * * *

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য-ভক্তি ও মুক্তি

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আদ্যোপান্ত নানাস্থানে বেদান্তপ্রতিপাদ্য মোক্ষকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, এবং ঐ মোক্ষপ্রাপ্তি কিরূপে হয় তাহা নির্ণয় করাই ঐ গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অধিকন্তু ঐ পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের নিমিত্ত ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া ভাগবতবক্তা নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে সাধনভক্তিবলে অহংবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বময় কার্যব্রহ্মে সাধক প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করেন; তখন সমস্ত কামনা দূরীভূত হয় এবং চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে—তদবস্থায় পরাভক্তি লাভ হয়; সেই পরাভক্তি দ্বারা পূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, এবং পরে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

সাধনের প্রবর্তাবস্থায় প্রথমে মোক্ষাভিলাষ সাধারণতঃ সকলেরই থাকে; "ভজনের দ্বারা আমার সর্বদুঃখ দূর হইবে, সংসার ভ্রমণ নিবৃত্ত হইবে, আনন্দে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত হইব—এই বাসনাই সাধারণতঃ ভগবদ্‌ভজন বিষয়ে প্রবর্তক হয়। পরে যে পরিমাণে সাধক ভজনে তন্ময়ত্ব লাভ করেন, সেই পরিমাণেই বাহ্যিক সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার অনাসক্তি জন্মে; এবং ভগবানে প্রীতি বর্ধিত হয়। এই ভগবৎরতি দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিলে, তাহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া, ধ্যাতা ধ্যেয়ের পার্থক্যজ্ঞান স্বভাবতঃ দূরীভূত হয়; সেই সময় কাজেই তাহার মোক্ষবাসনাও অন্তর্হিত হয়, কোন বাসনাই থাকে না; ইহাই "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" পদের দ্বারা ভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন।

মোক্ষবাসনাও "বাসনা", সুতরাং ঐ বাসনাও তদবস্থায় তিরোহিত হয়।...কিন্তু ইহা এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে সর্ববিধ বাসনা (সুতরাং মোক্ষবাসনাও) দূরীভূত হইলে যে পরাভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তির শেষ ফল ভগতত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষপ্রাপ্তি।....বস্তুতঃ পরমমোক্ষপ্রাপ্তি এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভাগবতের বর্ণনার মুখ্য বিষয় হওয়াতে, মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে মোক্ষবাসনাও যে পরিহার্য তাহা যেমন অনেক স্থানেই গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ মোক্ষবাসনা না থাকিলেও যে পরাভক্তির শেষ ফল মোক্ষপ্রাপ্তি তাহাও বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।.... অতএব, ভক্তগণের মোক্ষকামনা না থাকা হেতু মোক্ষের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া, বরং ভক্তিই যে তাহার সাধন, এই মাত্রই উক্ত প্রমাণসকল দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

—("শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়"—পৃঃ ৮, ৯, ১৫)

শ্রীকৃষ্ণ ও পরব্রহ্ম

সর্ববিধ শাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অসংখ্য স্থানে ভগবানের নিজ পরব্রহ্মস্বরূপ যে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং নির্গুণ তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। বসুদেব বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবৎরূপ দর্শন করিয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাতেও ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে; উহাই তাঁহার স্বভাবগত স্বরূপ। ভগবানের যে নির্মলসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাধিপতিরূপ যাহা অবতার গ্রহণ করা কালে প্রথমে বাসুদেব ও দেবকীর নিকট তিনি প্রকট করিয়াছিলেন তাহা

দেবতাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, মর্ত্ত্যে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কারণ ইহা সূর্যের অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী বলিয়া সর্বত্র বর্ণিত আছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত দিব্যচক্ষু প্রদান করেন, তিনিই ঐরূপ দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ভগবান্ যে শিশুমূর্তিতে প্রকটিত হইলেন, সেই রূপটি তো মর্ত্ত্য মানব এমন কি পশুপক্ষীর পর্যন্ত দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ছিল বলিয়া ভাগবতকার সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজবাসী মনুষ্য, গো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পার্থিব জীব তো সকলেই তাহা দেখিয়াছিল, পরন্তু অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি নিকৃষ্টদেহধারী অসুরেরাও তাঁহাকে অবাধে দর্শন করিয়াছিল; কালীয় নাগ তাঁহার মর্মস্থানে দংশন ও শরীরকে দৃঢ়রূপে বেষ্টনও করিয়া তীব্র বিষের জ্বলায় প্রথমে তাঁহাকে অভিভূতপ্রায়ই করিয়াছিল। পরে মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি যে যে স্থানে তিনি যখন গিয়াছেন, সর্বত্রই সকলে তাঁহার ঐ দেহের দর্শন শ্রবণাদি স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করিয়াছিল। এই "রূপ"কে কি প্রকারে তবে সর্বশাস্ত্রের উপদেশানুসারে, বাক্য, ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? অবশ্য প্রাকৃত জগৎও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; মুক্ত পুরুষগণ এই প্রাকৃত জগতের সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন—ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু সেই দর্শন যে প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন নহে, তাহাও সর্বশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। তাঁহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে জ্ঞাননেত্র হয়েন, এবং তদ্দ্বারাই জগতের ব্রহ্মরূপতার অনুভূতি যে তাঁহাদের হয়, ইহা সর্বত্রই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পৃথিবীতলস্থ সর্বসাধারণ মনুষ্য,

পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই ভগবানের এই অবতাররূপে সর্বত্র প্রাকৃতিক নেত্র দ্বারাই দর্শন করিয়াছে। অতএব ... ... এই অবতার-রূপকেই ভগবানের নিজ অবিকৃত পরব্রহ্ম বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়?

—(শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—পৃঃ ৩৩-৩৪)

অবতারোপসনার গূঢ় তত্ত্ব

এই গোলোকবৈকুণ্ঠাধিপতি (হরির) রূপ মূর্ত হইলেও ইহা অমূর্ত সচ্চিদানন্দময় ভগবানেরই রূপ, সুতরাং গোলোকবৈকুণ্ঠাধিপতি তাঁহার নিজ মূর্তরূপে যেমন উপাস্য, তদ্রূপ অমূর্ত সচ্চিদানন্দময়-ভাবেও তিনি উপাস্য হয়েন; কারণ একেরই উভয়রূপ। এই উভয়রূপ বুঝাইতেই ভাগবানের কৃষ্ণ সংজ্ঞা হইয়াছে; "কৃষ্ণ" বলিতে ঐ উভয়রূপই বুঝায়; (এবঞ্চ ইহা তাঁহার মুখ্য অবতার-রূপেরও বাচক)। সুতরাং গোলোকাধিপতিই জীবের কল্যাণ-সাধনার্থ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, মনুষ্যাদি রূপ, যাহা মনুষ্যের সহজে ধ্যানগম্য হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া এই লোকে অবতীর্ণ হয়েন। এই অবতারমূর্তি সকল তাঁহার গোলোকাধিপতি রূপ হইতে ভিন্ন; তাঁহার অক্ষর ও অমূর্ত সচ্চিদানন্দময় রূপ হইতে তো ভিন্ন বটেই। কিন্তু ভিন্ন হইলেও ইহা তাঁহারই ধৃত রূপ। এই অবতাররূপ মনুষ্যাদিরূপের সমশ্রেণীর রূপ। পরন্তু তাহা হইলেও সাধারণ জীবদেহের সহিত ইহার বহু পার্থক্য আছে।...সাধারণ জীবদেহের ন্যায় ইহা ভৌতিক নিয়মে গঠিত নহে; জন্মান্তরের কর্মানুসারে ভূত-গণ পরিচালিত হইয়া ঐ সকল কর্মের ফলভোগের উপযোগী করিয়া

সাধারণ জীবদেহ প্রস্তুত করে। ভগবদবতার দেহ কিন্তু তদ্রূপ সৃষ্ট হয় না। ভগবানের ইচ্ছাই ইহার নিমিত্ত-কারণ। ভৌতিক পদার্থ সকলকে নিজ অবতার দেহ নির্মাণের জন্য ভগবান্ নিজ ইচ্ছার দ্বারা নিয়মিত করিয়া ঐ দেহ প্রস্তুত করেন, ও যেরূপ লীলার জন্য অবতার গ্রহণ করেন তিনি তাহাতে তদনুরূপ শক্তিও সঞ্চারিত করেন। পরন্তু ভৌতিক পদার্থ সকলও তাঁহারই এক প্রকার মূর্তরূপ তাঁহা হইতে বিভিন্ন নহে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্", "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা", "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" এবং "বাসুদেবঃ সর্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকল ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ক্ষিত্যপ্‌তেজ আদি জাগতিক রূপ ভগবানের হইলেও, এই সকল তাঁহার বাহ্যরূপ, অন্তরঙ্গরূপ নহে। এবঞ্চ এই অবতাররূপে যে সকল লীলাকার্য ভগবান্ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারই লীলা, তাঁহারই কার্য। সুতরাং এই অবতাররূপের উপাসনাও তাঁহারই উপাসনা। পরন্তু এই রূপের উপাসনার চতুর্বিধত্ব আছে: (১) অবতারের নিজরূপে (মনুষ্য, মৎস্য, কূর্মাদিরূপে) উপাসনা, (২) গোলোকাধিপতি মূর্তরূপে উপাসনা, (৩) মূর্তসমষ্টি বিরাট্‌রূপে উপাসনা, এবং (৪) অমূর্ত নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দময়রূপে উপাসনা। প্রত্যেক অবতাররূপে এই চতুর্বিধ ভাব অন্তর্নিহিত আছে। এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে জানিয়া রাখিলে শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকলের ভাব গ্রহণ করিতে আর ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা ও স্তুতিতে সর্বত্র এই চারিটীর মধ্যে কোন না কোনটীর বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন্ রূপটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ স্থলে বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা তত্তৎস্থলের বিবক্ষার বিচারের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে।

—(শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—পৃঃ ৫৬-৫৭)

৬

এক সময় বৃন্দাবনে সন্তদাসজীর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে স্পর্শদোষ, জাতিভেদ, খাদ্যের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ, কর্মযোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হত। বিষয়গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ব্রহ্মচারীমহাশয় তাঁর গুরুদেবকে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে সন্তদাসজী মহারাজ যা যা বলেছিলেন তারই যথাযথ শ্রুতলিপি "কথাপ্রসঙ্গ" নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব এবং পুস্তিকাটির দুষ্প্রাপ্যতা বিবেচনা করে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছি। সন্তদাসজী যে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন তার কিছু পরিচয় এতে পাওয়া যাবে; চল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারত-বর্ষের তাৎকালিন সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন, তার যাথার্থ আজ আরো বেশি প্রত্যক্ষীকৃত হচ্ছে।

১। স্বৈরাচার ও সামাজিক বিপর্যাস যেমন একদিকে অবশ্যম্ভাবী বলেছেন, তেমনি আর একদিকে এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে যাওয়াটাও সমীচীন নয় এ কথাও বলেছেন। কালস্রোত রোধ করা অসম্ভব এবং তার প্রবাহ বর্তমানে উন্নতির পথে নয়, দ্রুত অধোগতির দিকে। এ থেকে বোঝা যাবে সন্তদাসজী অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে আদৃত প্রগতিবাদে বিশ্বাস করতেন না।

২। আহার্য বিচারের প্রসঙ্গে একটা ভারি চমৎকার কথা বলেছেন। রোগীর পক্ষে পথ্যাপথ্য বিচার আমরা সকলেই অবশ্য কর্তব্য মনে করি, কিন্তু আহারের শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার কুসংস্কার বলে যখন উড়িয়ে দিই, তখন একটা জিনিষ আমরা ভুলে যাই: আধ্যাত্মিক দিক্‌ থেকে বিচার করলে আমরা সকলেই অসুস্থ রোগী।

৩। ধ্যান ও সমাধি সকলের জন্য নয়; বস্তুতঃ চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল ও একাগ্র না হলে এ সব উচ্চাঙ্গের সাধনে অধিকারই জন্মায় না—এ কথাটা সন্তদাসজী খুব পরিষ্কার করে বলেছেন। অধিকারী না হয়ে ঐ উচ্চাঙ্গের সাধন অবলম্বন করতে গেলে সেটা হঠকারিতা মাত্র হবে। শুধু তাই নয়, নিম্নাঙ্গের সাধনের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তাঁর সেদিকেও প্রবৃত্তি হবে না; ফলে অবস্থাটা হবে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ"। তাই ভগবদ্গীতায় বলেছেন "আরুরুক্ষু" অর্থাৎ

যোগভূমি-আরোহণেচ্ছুর পক্ষে কর্মযোগই অবলম্বনীয় ; তার ফলে ক্রমশঃ কর্ম ও কর্মফলে অনাসক্তি উপজাত হয়ে চিত্ত একাগ্র হলে সাধক যোগারূঢ় হন ; তখনই তিনি প্রকৃতপক্ষে ধ্যান ও সমাধি অবলম্বনে সমর্থ হন।

আহার শুদ্ধি, স্পর্শদোষ ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা

বিধাতা পুরুষের সৃষ্টিতে তাঁহার অনন্তশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দুইটি পদার্থে ঠিক একপ্রকার শক্তি নাই। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুণগত প্রভেদ অবশ্য বর্তমান থাকে। এই সমস্ত শক্তির প্রভেদ জ্ঞাত হওয়া এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহা ব্যবহারে আনয়ন করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উন্নতিরই পরিচায়ক হয়। ইহাতে ঘৃণা বিষয়ের কোন কথাই নাই। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে জানিয়া নিজ অনুকূল শক্তির গ্রহণ, নিজ প্রতিকূল শক্তির বর্জন বিজ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। ইহাতে ঘৃণা বিষয়ের কোন কথাই নাই। বিষ আমাদের শরীরের জীবনীশক্তির বিরোধী জানিয়া ইহাকে আমরা আহার্যরূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করি না, আবার বিষম জ্বর প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইলে, সেই বিষকেই আহার্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি ; ইহাতে ঘৃণা বিশেষের কোন কথাই উঠে না। মহেশ্বর সামর্থ্যী ছিলেন, সুতরাং তিনি হলাহলও পান করিয়া পরিপাক করিয়াছিলেন। যাঁহার এইরূপ সামর্থ্য নাই, তিনি তাহা পান করিবেন না ; ইহাতে ঘৃণা বিদ্বেষের কি কথা আছে? আর্যদিগের সর্ববিধ শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে যে সমস্ত জাগতিক বস্তুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অতএব সমস্তই ব্রহ্ম হওয়াতে সমস্তই শুদ্ধ। সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করাই সাধনভজন বিষয়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ সকলের শেষ উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত বস্তুই বিশুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বুদ্ধিকে অতিশয় নির্মল করা

আবশ্যক ; তন্নিমিত্ত আহার্য বস্তুর বিচার আবশ্যক হয়। ভিন্নপ্রকৃতি বহির্মুখীন লোকের সংস্পর্শে, সেই সকল বস্তু তত্তৎগুণাক্রান্ত হইয়া, সেই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পক্ষে বাধা জন্মায় ; এই নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। পায়স অতি উপাদেয় বিশুদ্ধ আহার্য বস্তু, কিন্তু কোন কোন রোগীর পক্ষে তাহা বিষবৎ বর্জনীয় হয়। বর্জনীয় বলিয়া যে ইহা তাহার পক্ষে ঘৃণণীয় বস্তু, তাহা নহে ; সুস্থ হইলে সে উহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করে। এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার আর থাকে না—সকলই শুদ্ধ। যাঁহার এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাঁহার বুদ্ধির নির্মলতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আহার্য বিষয়ে বিচার প্রয়োজনীয় হয়। তাঁহার পক্ষে অন্তর্মুখী শক্তি গ্রহণীয়, বহির্মুখী শক্তি বর্জনীয়, কিন্তু এই নিমিত্ত ঘৃণণীয় নহে। তিনি বহির্মুখীন শক্তির বেগ রোধ করিতে পারেন না—বহির্মুখীন শক্তি যে ব্রহ্মেরই শক্তি, তাঁহা হইতে অভিন্ন তাহা তাঁহার বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না,—তিনি অসমর্থ রোগী। রোগীর পক্ষে উত্তম পায়সও বর্জনীয়। কিন্তু বর্জনীয় বলিয়া যদি তিনি তাহার প্রতি ঘৃণা অথবা বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হন, তবে তিনি মূর্খ, শাস্ত্রোক্ত উপদেশের মর্ম তিনি বিপরীতরূপে বুঝিয়াছেন। অপাত্রে ন্যস্ত হইলে ধন যেমন পাপকার্যের সহায়কারী, বিদ্যা অপাত্রে পড়িলে যেমন দম্ভ ও অহঙ্কার বর্ধিত করে, বল অপাত্রের আয়ত্তাধীন হইলে যেমন পরপীড়নের হেতু হয়, কিন্তু সুপাত্রে পড়িলে যেমন সৎকার্যেরই সহায়কারী হয়, বিদ্যা, জ্ঞান ও বিনয় উৎপাদন করে, বল পররক্ষণের হেতু হয়—তদ্রূপ শাস্ত্রীয় এই সকল ব্যবহার-বিষয়ক উপদেশও কুপাত্রে ন্যস্ত হইলে হিংসা বিদ্বেষ উৎপাদনের হেতুভূত হয়, বিবেচক সাধকের পক্ষে ইহা সদ্বুদ্ধি উৎপাদনেরই হেতুভূত হইয়া থাকে।......

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে কোন কোন স্পর্শ আধ্যাত্মিক উন্নতি-

সাধনের খুব প্রতিকূল হয়; কিন্তু কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ প্রকার গুণ আছে তাহা এইক্ষণকার সমাজের অবস্থায় অবধারণ করা অতি কঠিন। কাহার স্পর্শে উপকার হইবে, কাহার স্পর্শে অপকার হইবে, তাহা নিরূপন করার কোন শক্তি সর্বসাধারণের নাই। পূর্বে জাতিভেদ প্রধানতঃ গুণগত ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কর্মগত ভেদও প্রায়শঃ তাহার অনুরূপ ছিল। বহু সহস্র বৎসর ব্যপী রাষ্ট্র-বিপ্লব, অশান্তি, ধর্মস্থাপক উপযুক্ত হিন্দু রাজার অভাব, বিপরীত-ধর্মীদিগের প্রাধান্য ও অত্যাচার এবং স্ত্রীপুরুষের সংযোগ বিষয়ে ব্যভিচারাদি দোষে পূর্বের গুণকর্মের ভেদানুসারে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জাতিভেদ এইক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে।....এইক্ষণকার সমাজে গুণগত, এমন কি কর্মগত ভেদের উপরও জাতি সকল প্রতিষ্ঠিত নহে। যে সকল জাতিকে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া সমাজে গণ্য করে, তাহাদের মধ্যেও সচ্চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্ এবং উত্তম ব্রাহ্মণের উপযুক্ত অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতির মধ্যেও অতি হীন-প্রকৃতি এবং হীন-ব্যবসায়ী লোক দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সময়ে কোন সামাজিক জাতি জানিলেই তাহার গুণ এবং কর্ম কিরূপ তাহা জানিতে পারা যায় না। অতএব স্পর্শ বিষয়ে কাহার সম্বন্ধে কাহার স্পর্শ শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে কল্যাণকর, কাহার স্পর্শ অকল্যাণকর তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে।

আর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিয়মের প্রবর্তন যে পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ স্থাপনের নিমিত্ত নহে, ছোট বড় ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নহে, ইহা যে বুদ্ধির নির্মলতা সম্পাদন করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি-স্থাপন পূর্বক সার্বভৌমিক প্রেম উপজাত করিবার জন্য ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা এইক্ষণ হীনা-বস্থাপ্রাপ্ত ভারতবাসী একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা

এই ভূমিতে এইক্ষণ বিলুপ্তপ্রায়, যাহা কিছু আছে তাহা সাধারণতঃ কেবল মতামত বিচারে এবং শুষ্ক তার্কিকতায় পর্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব এইক্ষণকার সমাজ বন্ধন শিথিল করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে একেবারে ভগ্ন করিয়া দেওয়া আমি এইক্ষণে সঙ্গত বিবেচনা করিতেছি না। তাহা করিলে সর্বপ্রকার নৈতিক বন্ধন বিলুপ্ত হইয়া যাইবার এবং সর্বপ্রকার বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অনাচার, পশুবৎ স্বেচ্ছাচার এবং ব্যভিচারাদির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জনসমাজকে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিবার সম্ভাবনা। কলির শেষে সমস্ত সমাজ বন্ধন ছিন্ন হইয়া সকলেই ম্লেচ্ছভাবে একাকার প্রাপ্ত হইবে, এবং তৎপরে সত্যযুগ আবির্ভূত হইয়া পুনরায় সার্বজনীন প্রীতি ও সাত্ত্বিক ধর্মবৃত্তি স্থাপিত হইবে এইরূপ ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন সত্য এবং সমাজও সেইদিকেই ধাবিত হইতেছে ; ইহা আমি দেখিতেছি। নূতন কল্পে বিজ্ঞানমূলক সমাজ সংস্থাপিত করিবার পূর্বে এই সমস্ত অবৈতনিক জাতিবিভাগ নাশপ্রাপ্ত হইয়া একাকার হওয়াও যে আবশ্যক তৎবিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। পরন্তু সমাজ বন্ধন একেবারে ভগ্ন করিয়া একাকার করিবার সময় যে এইক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি বিবেচনা করি না। সেই অবস্থা আসিতে আরও অনেক বিলম্ব আছে। অধ্যাত্মবিষয়ে নিজে রোগী, এই নিমিত্ত আহারের নিয়ম করা আবশ্যক, এবং এই নিমিত্ত যিনি আহার বিষয়ে নিয়ম করিবেন তাঁহার তন্নিমিত্ত অপরের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ছোট বড় বোধ থাকিবে না এবং তাঁহার এই সকল না থাকিলে অপরেও তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবে না।... সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজে সেবকভাব অবলম্বনপূর্বক অহঙ্কার-বিবর্জিতভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই আমাদের সর্বসাধারণ আদর্শ ; এই আদর্শ স্মরণ রাখিয়া চলিলে স্বভাবতঃই সাধারণ স্পর্শাদি বিষয়ে তোমাদের মনে কোন

প্রকার দ্বিধাভাব উপজাত হইবে না, এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ও উৎপাদন করিতে পারিবে না।...

নিজের অন্তরের ভাবশুদ্ধিই আসল জিনিষ জানিবে; অন্তরের ছোট বড় বোধ পরিত্যাগ না হইলে কেবল আহারাদি বিষয়ে স্পর্শদোষ ও বিচার অগ্রাহ্য করিলেই যে চিত্ত নির্মল হইয়া পরস্পরের প্রতিও ভ্রাতৃভাব উপজাত হইবে, ইহা সত্য নহে।....অতএব যাঁহারা মনে করেন আহারাদি ব্যাপার সম্বন্ধে স্পর্শাদি বিচার একেবারে উঠাইয়া দিলেই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাঁহাদের মতের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকা আমি দেখিতে পাই না। সেই সময় আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে যে সময়ে ভারতবাসী সকলে পরস্পরের প্রতি সর্বপ্রকার বিদ্বেষভাববিরহিত হইবে এবং সকলে পরব্রহ্মোপাসক হইয়া নির্মলান্তঃকরণ ও সদাচারসম্পন্ন, সুতরাং ব্যবহারিক-ভেদ-রহিত হইয়া একত্র সুখে বসবাস করিবে।

—("কথাপ্রসঙ্গ"—পৃঃ ৮-১৪)

সর্বসাধারণের অবলম্বনীয় সাধন

প্রশ্ন: আমরা কি উপায়ে ভগবান্‌কে লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারি? কেবল কর্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় কি না?

উত্তর: ভগবান্ নিজ কৃপাবলে যাঁহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" তাঁহার দর্শনলাভ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর্মের ফল নহে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মায়; অর্থাৎ তখন রজঃ ও তমোগুণ চিত্তের পরিচালক হয় না, সত্ত্বগুণই চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। চিত্তের এইরূপ সম্পূর্ণ শুদ্ধাবস্থা হইলে তাহার লক্ষণ এই হয় যে, সাধক অহঙ্কারশূন্য হইয়া সর্বত্র সমদর্শী হয়েন এবং চিত্ত স্বয়ং প্রসন্নভাব ধারণ করিয়া সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি

আসক্তিশূন্য হয়। এই অবস্থা হইলে স্বভাবতঃ ভগবানের প্রতি সাধকের ঐকান্তিক অনুরাগ উপজাত হয়। ইহাকে পরাভক্তি বলে। এইরূপ পরাভক্তিযুক্ত সাধকের নিকট ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি তখন সম্যক্ ভগবৎস্বরূপ অবগত হইয়া অন্তিমে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন। ইহাই পরম মোক্ষ। এই ঐকান্তিক মোক্ষ লাভ দেহান্তেই হয়। এই মোক্ষলাভ হইলে সর্ব-প্রকার দুঃখ দূর হয় এবং আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মে। আমা-দিগের (বৈষ্ণবদিগের) সম্বন্ধে উপাসনা ও সেবারূপ কর্মই সেই নিষ্কাম কর্ম। সাধক নিজের কোন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি কামনা করিয়া যখন কর্ম করেন না, কেবল ভগবৎসেবা ও উপাসনার্থে কর্ম করিয়া থাকেন ভগবৎপ্রীতি উৎপাদন করাই যখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য থাকে, তখনই তাঁহার কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা যায়।

ভগবান্ নিম্নলিখিতরূপে সাধারণতঃ বৈষ্ণবদিগের উপাসনার বিষয় হয়েন, যথাঃ—

১। চিদানন্দময়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপ। ইহা নিরাকার আমরা আকার বলিতে যাহা কিছু বুঝি ভগবানের এই রূপ তৎসমস্তের অতীত হইলেও ইহাতে সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তা আছে। তাঁহার কেবল অক্ষর, চিদানন্দময়, নিরাকার, ঈশ্বরত্ববিহীন রূপ সচরাচর বৈষ্ণবগণের উপাসনার নিমিত্ত ধ্যেয় নহে।

২। এই অনন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক বিশ্বরূপ-দেহাধিষ্ঠিত আদিপুরুষ, যিনি হিরণ্যগর্ভ নামে শ্রুতিতে আখ্যাত হইয়াছেন, এবং যাঁহার বিভিন্ন অবয়ব সকল বিভিন্ন লোক রূপে কল্পিত হয়।

৩। লোকসকলের মধ্যে উর্দ্ধতম গোলোক-বৈকুণ্ঠাধিপতি।

৪। ঐ শ্রীকৃষ্ণের অবতার সকল।

৫। মুক্তপুরুষ সকল।

সর্বপ্রকার বিষয়-সঙ্গ-বর্জিত সাধক—যাঁহার মন সর্বপ্রকারে বশীভূত ও একাগ্র হইয়াছে তিনিই নিজের প্রকৃতি এবং গুরুপ্রদত্ত উপদেশানুসারে ইহার অন্যতমরূপে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া সমাধিরূপ কর্ম অবলম্বন করিবেন। (তবে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ রূপের মধ্যে প্রথম উক্ত নিরাকার রূপ সাধারণতঃ ধারণার বিষয় হয় না। অতএব সাধারণতঃ বৈষ্ণবগণ প্রথমতঃ সেই রূপটিকে উপাসনার নিমিত্ত অবলম্বন করিতে যত্ন করেন না।) সমাধিই যোগের শেষ অবস্থা। তদ্দ্বারা সাধকের চিত্ত হইতে বিষয়চিন্তা একেবারে দূরীভূত হইয়া চিত্ত অহঙ্কারশূন্য হয় ও আকাশের ন্যায় ব্যাপ্তি অবলম্বন করে ; সাধক সমস্ত ভূতগ্রামকে তখন আপনারই মধ্যে দর্শন করিতে থাকেন ; সুতরাং ক্রমশঃ সর্বত্র সমদর্শী হন এবং অবশেষে ক্রমশঃ স্বভাবতঃ পূর্ববর্ণিত পরাভক্তি লাভ করেন।

যাঁহাদের মন পূর্বোক্ত প্রকারে একাগ্র হয় নাই তাঁহারাও বিষয়-বৈরাগ্যযুক্ত হইলে অল্পে অল্পে ভগবদ্‌ধ্যান অবলম্বন করিয়া ধ্যানের মাত্রা ক্রমশঃ বর্ধিত করিতে অভ্যাসশীল হইবেন। অভ্যাস করিতে করিতে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ একাগ্র হইবে, মনের বহির্মুখীন বৃত্তিসকল রুদ্ধ হইয়া মন শান্তভাব অবলম্বন করিবে, তখন তাঁহারাও ক্রমশঃ পূর্বোক্ত সমাধির অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন।

যাঁহাদের মন কোন প্রকারে বশীভূত নহে, যাঁহারা অল্পকালের জন্যও মনকে সম্যক্ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবদ্‌মূর্তিতেস্থির করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে ভগবৎসেবারূপ উপাসনা—ধর্মা-বলম্বনই বিধেয়। পরন্তু বশীকৃতমন, একাগ্রচিত্ত পুরুষের মধ্যে অনেকে সমাধির পন্থা অবলম্বন না করিয়া ভগবৎসেবার পন্থাই অবলম্বন

করিয়া থাকেন। উভয়শ্রেণীর ভগবৎসেবকগণই কেবল ভগবৎসেবার নিমিত্ত সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন। নিজের দেহকে যে আহার্য্য দিয়া পুষ্ট রাখা তাহাও ভগবৎসেবার নিমিত্তই তাঁহারা করিয়া থাকেন। স্থূল দেহ ভগবৎসেবার মুখ্য অবলম্বন। অতএব ইহাকে কর্মঠ রাখাও ভগবৎসেবার মধ্যেই তাঁহারা গণ্য করেন।........

এইরূপ সেবা করিতে করিতে যখন ভগবৎসেবাতে মতি দৃঢ় হয়, তখন সাধকের বিষয়বাসনা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, সুতরাং ভগবৎ-চিন্তায়ই মন আকৃষ্ট হয়, অন্যদিকে আর ধাবিত হয় না। ভগবৎ-নাম জপ এবং ধ্যান ভগবৎপূজার অঙ্গীভূতরূপে সকলকেই কিছু কিছু করিতে হয়। অতএব এই অবস্থা উপস্থিত হইলে সাধক-দিগের মধ্যে অনেকে ধ্যান বিষয়ে অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পূর্বোক্ত সমাধিরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, অন্যবিধ সেবাকর্ম তাঁহাদের তখন পরিত্যক্ত হইয়া যায়। অনেকে বা সেবাকর্ম করিতে করিতেই ভগবৎ-স্বরূপ-চিন্তনে এমন অনুরক্ত থাকিতে পারেন যে, ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ের গ্রন্থিসকল আপনা হইতে খুলিয়া যায় এবং তাঁহারা নিরহঙ্কার, সমদর্শী হইয়া ক্রমশঃ একেবারে পরাভক্তি লাভ করেন।

যাঁহারা এইরূপ বিগ্রহাদির সেবা করিতেও অসমর্থ (সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির মধ্যে অধিকাংশই এইরূপ) তাঁহাদের পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় স্বীয় কর্ম সম্পাদন করিতে অভ্যাস করাই কর্তব্য। এখনকার কালে পূর্বের ন্যায় জাতিভেদ গুণকর্মের ভেদের উপরপ্রতিষ্ঠিত নহে, এবং এখনকার কাল সর্বপ্রকার ধর্ম-সাধনের বিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা ধর্মের পক্ষে আপৎকালই বটে; আপৎকালে জীবনযাত্রা নির্বাহার্থ যে কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, তাহার কোন নিয়ম অবধারিত থাকে না; সুবিধানুসারে ভাগ্যক্রমে যাহার সম্মুখে যে প্রকার কর্ম উপস্থিত হয়,

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাহাকে সেই প্রকার কার্যই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব কাহার পক্ষে কোন্ কর্ম শাস্ত্রসঙ্গত, কোন্ কর্ম শাস্ত্রসঙ্গত নহে, এই বিষয়ে বিশেষ বিচার পরিত্যাগ করিয়া যাহার যে কর্ম করিতে হইতেছে সেই কর্মকেই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সম্পাদন করিলে তাহাতেই কল্যাণলাভ হইতে পারে। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কিরূপে কর্ম করিতে হয় তাহা বলিতেছি। নিজের শরীর রক্ষা, আশ্রিতজনের প্রতিপালন এবং সাধারণতঃ জীবমাত্রের যথাসম্ভব সেবা সকলের সম্বন্ধেই কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্র-মুখে ভগবদাদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য কর্তব্য, তন্নিমিত্ত অর্থোপার্জনাদি প্রয়োজনীয়, এই কর্তব্যবুদ্ধিতে আমি কর্ম করিতেছি —যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আমি ক্রটী করিব না, কিন্তু ঐ চেষ্টার ফল আমার হাতে নহে, তাহার ব্যবস্থা বিধাতাপুরুষ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারই নিয়তির অধীন। ভগবৎপ্রীত্যর্থ-ভগবদাজ্ঞা পালন জ্ঞানে বৈষ্ণব গৃহস্থগণ এইরূপে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহাও এক প্রকার ভগবদুপাসনার মধ্যে গণ্য। এইরূপে কর্ম করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির বেগ সংযত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বুদ্ধি এমন সূক্ষ্ম ও নির্মল হয় যে সাধক ক্রমশঃ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন যে, বাস্তবিক তাঁহার কর্মবিষয়ক সামর্থ্যও নিজের নহে, ইহাও ভগবৎপ্রেরিত, এবং তিনিও নিজে পৃথক্ নহেন, জগতের সহিত একসূত্রে গাঁথা আছেন। এইরূপ ভাবনায় বুদ্ধি ক্রমশঃ নির্মল হইতে থাকিলে তিনি বুঝিতে থাকেন যে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ (গীতা, ১৮।৬১)

অস্যার্থঃ (ভগবান্ বলিতেছেন) হে অর্জুন ! সমস্ত প্রাণিবর্গের

হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থিত থাকিয়া সকল জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নিজ মায়াশক্তি দ্বারা সঞ্চালিত (ভ্রাম্যমাণ) করিতেছেন।

এইরূপে ঈশ্বর সর্বকর্মের প্রেরক ইহা বোধগম্য করিয়া সাধক নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করেন ; ইহাকেই ব্রহ্মে কর্মার্পণ বলা যায়। এইরূপে ব্রহ্মে কর্মার্পণ করিয়া তিনি নির্লিপ্ত হইলে তাঁহার মন বাহ্য পদার্থের প্রতি আর আসক্ত হয় না, এবং তাঁহার বশবর্তী হয় ; তখন তিনি সর্বসঙ্গরহিত হইয়া সমাধি অবলম্বন করিতেও সমর্থ হয়েন, এবং কেহ বা অপর সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবদিগের আচরিত ভগবৎসেবারূপ কার্য ও উপাসনা অবলম্বন করেন। যে কোন পন্থা অবলম্বন করুন, অবশেষে তিনি অহঙ্কারবর্জিত হইয়া সন্তোষ ও সমদর্শন লাভ করেন এবং অবশেষে পরাভক্তিপ্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন। কেহ কেহ এইরূপ নির্লিপ্ত কর্ম করিতে করিতেই ভগবৎ-কৃপায় একেবারে সমদর্শন লাভ করিয়া অবশেষে পরাভক্তিসমন্বিত হয়েন।........

আপন অধিকার (সামর্থ্য) যথার্থরূপে বোধগম্য না করিয়া যিনি কোন বিশেষ প্রকার সাধনকে (যেমন ধ্যান ও সমাধিকে) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ত্বরমান হইয়া তাহা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার ইচ্ছা সফল হইবে না। তাঁহার আরও অধিক বিলম্ব হইবে। কারণ পূর্বোক্ত উচ্চভূমির কর্ম তিনি কখনও সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন না। যে সময়টুকু উহাতে যাপন করিবেন তাহা বৃথা নষ্ট হইবে। অধিকন্তু নিজের অধিকারগত কর্মের প্রতি হেয়বুদ্ধি থাকাতে তাহাও পুনরায় গ্রহণ করিতে সহজে ইচ্ছা করিবেন না ; সুতরাং তিনি কোন সাধনাই তখন অবলম্বন করিতে না পারিয়া কাণ্ডারীবিহীন নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবেন। অতএব আপন অধিকার গত নিম্নস্তরের সাধন অবলম্বন করিলেই তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের শুদ্ধি সংঘটিত হইবে এবং তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া

উচ্চস্তরের সাধন গ্রহণের অধিকারী হইতে পারিবেন। এই অধিকার-ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। ৬।৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৬।৪

অস্যার্থ: যোগাবস্থালাভেচ্ছু মননশীল পুরুষের পক্ষে কর্মকেই ঐ বিষয়ের কারণ বলা যায়। এবং যোগভূমি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐ ভূমিতে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা পক্ষে "শম" অর্থাৎ সমাধিকেই কারণ বলা যায়। ৬।৩

যখন পুরুষ সর্বপ্রকার বিষয়ভোগসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে এবং তদ্‌বিষয় প্রাপ্তিনিমিত্ত কর্মেতে আসক্তচিত্ত হয়েন না, তখনই তাহাকে "যোগারূঢ়" বলা যায়। ৬।৪

ইহাতে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যাঁহার চিত্ত নির্মল হয় নাই—যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যোগী হইতে পারেন নাই কিন্তু যোগী হইতে ইচ্ছামাত্র করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে কর্মযোগই শ্রেয়স্কর; কর্মযোগ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়া মনস্থির ও চিত্ত শান্তহইবে—তখনই তিনি যথার্থ ভগবৎসমাধি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন।

—("কথাপ্রসঙ্গ"—পৃঃ ১৪-২৫)

সিদ্ধভূমির এই লক্ষণগুলি সন্তদাস স্বামীজীর গৃহস্থ অবস্থায় রচিত তাঁর গুরুদেব "শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত" থেকে উদ্ধৃত। বাংলা ভাষায় সিদ্ধ মহাপুরুষ বা সাধকের জীবনী আজ পর্যন্ত যত রচিত হয়েছে তার মধ্যে এই গ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করে। পাণ্ডিত্য-ভারাক্রান্ত তত্ত্বালোচনা কোথাও নেই, কেবল ঘটনার সংযত, নিরুচ্ছ্বাস, যথাযথ বিবৃতির মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এক লোকাত্তর পুরুষের অপরূপ মহিমা। ভক্তি এখানে কোথাও উদ্বেল হয়ে সত্যকে প্লাবিত করে নি ; এমন কি গুরুর সাধারণ-গ্রাম্য-বৃদ্ধোচিত আচরণে এক সময় তাঁর যে গভীর নৈরাশ্য ও দারুণ সংশয় হয়েছিল তাও কিছুমাত্র গোপন করেন নি। অনেক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ঘটনা; নানা অদ্ভুত বিভূতি ও অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ বারবার প্রত্যক্ষ করেও গুরুদেবের অবতারত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর হন নি—এটা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তৎপর যে হন নি তার মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা ; তাছাড়া আর একটা কারণও ছিল : ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অপরিসীম মহিমা গুরুকৃপায় তিনি কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করেছিলেন, তাই একথা জানতেন যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে অবতার বললে তাঁর গৌরব কিছু বাড়ে না, হয়ত কমে।

এই সিদ্ধভূমিগুলির বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে অধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রগতি কি, এবং সিদ্ধিলাভ কত কঠিন! চতুর্থভূমির সম্বন্ধে বলেছেন এই ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষ অতি বিরল। এই চতুর্থভূমিই ভগবদ্গীতার বর্ণিত ব্রহ্মভূতঃ; প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" অবস্থা। পঞ্চমভূমিতে পরাভক্তি আবির্ভূত হয় ; তারপর ব্রহ্মজ্ঞান। "পঞ্চমভূমিও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন পুরুষ যুগে যুগেই বিরল।" এই পঞ্চম ভূমিও অতিক্রম করিলে সাধক যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হন। স্থূলদেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে জীবন্মুক্ত হয়েছেন এমন পুরুষ যে কত বিরল তা গুরু-শিষ্য-সংবাদের একটি উক্তি থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে : "ইহাদের (অর্থাৎ যাঁরা স্থূল দেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের) সংখ্যা যুগে যুগেই অতি অল্প জানিবে।" ভগবদ্গীতায়ও ভগবান্ এই কথাই বলেছেন, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

সিদ্ধ ভূমির লক্ষণ

চিত্ত নির্মল হইলে ক্রমশঃ সাতটি সিদ্ধভূমি পর পর লাভ হয়। এই সকল সিদ্ধভূমির বিষয় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ (শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ) প্রায় প্রকাশ করিতেন না। আমি এক-দিবস মাত্র তাঁহার নিকট এই সকল ভূমির তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ভূমি সাধারণতঃ গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত আছে। পঞ্চমভূমিও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন পুরুষ যুগে যুগেই বিরল। অতএব কেবল এই প্রথম পাঁচটি ভূমিরই বিবরণ সংক্ষেপতঃ এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই সকল ভূমির বিষয় চিন্তা করিলে সাধারণ সাধকদিগের একদিকে সাধনাভিমান দূর হইতে পারে এবং অপর দিকে উচ্চভূমি সকলের আদর্শ স্মরণ হইলে সাধন বিষয়ে যত্ন ও নিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এই সকল ভূমির বিবরণ নিম্নে লেখা হইতেছে।

প্রথম ভূমি :—এই ভূমির সাধকের অবস্থা এই, যথা :—

"গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর্ মান।
ইসিকো জান প্রথম ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তভাব এবং গুরুতে ও তীর্থেতে অনুরাগ স্বভাবতঃ এই ভূমিতে জন্মে। ইহা ক্ষণিকভাব নহে। এই ভূমিপ্রাপ্ত সাধকের ইহা প্রকৃতিগত সর্বদা স্থায়ী ভাব।

দ্বিতীয় ভূমি :—

"হম্‌মে কোন্, জগৎমে কোন্, ইস্‌কা ধ্যান্
দুস্‌রা ভূম্‌কা প্রমাণ।"

জগতের অনন্ত কার্যশৃঙ্খলার এবং জীবের ভাবনিচয়ের নিয়ামক

ও প্রবর্তক কে, নিয়ত তদ্বিষয়ক ধ্যান যাঁহার স্বভাবগত হইয়াছে, তিনি দ্বিতীয় ভূমি লাভ করিয়াছেন। ইহা ক্ষণিক চিন্তা নহে, এই চিন্তা প্রকৃতিগত এবং সর্বকালস্থায়ী। পিপাসার্ত পুরুষ যেমন পানীয় জল সর্বত্র অন্বেষণ করেন এবং তাহা পান না করা পর্যন্ত যেমন কোন প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারেন না, এই দ্বিতীয়-ভূমি-প্রাপ্ত পুরুষও আপনার এবং জগতের নিয়ন্তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত অহর্নিশি তদ্বিষয়ে তৃষ্ণাতুর থাকেন।

তৃতীয় ভূমি :—

"এক ব্রহ্ম জগৎমে জীব্‌মে বস্‌তা হ্যায় ঔর সব্‌কি কারণ।
য়ে হ্যায় তিস্‌রা ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

তৃতীয়-ভূমি-লব্ধ সাধকের সর্বগতব্রহ্মবোধ জন্মে ; এক ব্রহ্ম-শক্তিকেই তিনি আপনার ও জগতের আধারভূত বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত হয়েন। অনুমান দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে অনেকে উপনীত হয়েন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান কোন ভূমিরই লক্ষণ নহে। তৃতীয়-ভূমি-প্রাপ্ত পুরুষের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী আনুমানিক জ্ঞান নহে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের চিত্ত অবস্থিত হওয়াতে জাগতিক সর্ববিধ সিদ্ধি তাঁহাদের করতলন্যস্ত হয়।

চতুর্থ ভূমি :—

"সর্বত্র সমদর্শন ঔর্‌ অখণ্ড্‌ সন্তোষ।
চৌথা ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

সর্বত্র এক ব্রহ্মশক্তির কার্য এই ভূমিতে পরিস্ফুট হয় ; সুতরাং ভেদবুদ্ধি সম্যক্‌ তিরোহিত হয়। এই চতুর্থভূমিলব্ধ পুরুষ অতি বিরল।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি প্রভৃতি কোন অবস্থান্তরই এই ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের সন্তোষের খর্বতা জন্মাইতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চম ভূমি ঃ—

"নারদ ভক্তি প্রেম, পঞ্চম ভূম্‌কা প্রমাণ।"

পঞ্চম ভূমিতে অহেতুক প্রেম, যাহা "পরাভক্তি" নামেও আখ্যাত হয়, তাহা সাধক লাভ করেন। নারদ ঋষি ভগবান্‌ হইতে বরস্বরূপে এই প্রেমময় ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি এই ভূমি নারদভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই ভূমি প্রাপ্ত হইলে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্মলতা হেতু সাধকের পতন আর সম্ভব হয় না। অতঃপর পর পর যে দুই ভূমি আছে, তাহা আপনা হইতে ক্রমশঃ লব্ধ হয়। এই সকল ভূমির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অপ্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমির লক্ষণ এই স্থলে বর্ণনা করিতে নিবৃত্ত হইলাম।........বাস্তবিক বাহিরের তর্ক-প্রমাণের দ্বারা এই সকল মহাত্মাদের অবস্থা প্রকৃতরূপে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। যাঁহাদের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সকল অবস্থা নিরূপণ করিতে সমর্থ হন। সর্বশেষ-ভূমি-প্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে গুরু-উপদেশানুসারে এই মাত্র বলিয়া এই গ্রন্থাংশ সমাপন করিতেছি যে, তাঁহাদের কার্যকলাপ সমস্ত সাধারণ জীববুদ্ধির অগোচর। তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জীবের সর্ববিধ বিচার ব্যর্থ ও নিষ্ফল। তাঁহারা অপরের উপাস্য ও ভজনীয় হয়েন।

—(শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত—
পৃঃ ২১২-২১৫)

৮

* সন্তদাসজী মহারাজের দুই খণ্ডে প্রকাশিত "পত্রাবলী" এবং "প্রকাশিত পত্রাবলী" হতে পত্রাংশগুলি নির্বাচিত। কোন সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে এই অংশগুলি সন্নিবেশিত হয় নি ; পৌর্বাপর্য রক্ষা বোধ হয় এক্ষেত্রে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, কারণ প্রতিটি উদ্ধৃতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

১। শান্তিসোপান। একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষনীয় : অশান্তির কারণ নিঃশেষে দূরীভূত হবে, এ আশ্বাস—যা সাধারণতঃ শিষ্য গুরুর কাজে প্রত্যাশা করে থাকেন—সন্তদাসজী কোথাও দেন নি। এ দিক থেকে বিচার করলে তাঁর পত্রাবলী সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে নৈরাশ্যজনক মনে হওয়া বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক। "নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ দর্শন করিয়াও যাঁহার মনের শান্তির ব্যাঘাত জন্মে না, তিনিই অবিচলিত শান্তি লাভ করিতে পারেন। স্থায়ী শান্তি লাভের পথ যদি এই হয়, তা হলে ও আশায় জলাঞ্জলি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা অনেকেরই হয়ত মনে হবে। দুঃখ দূর হয়ে সুখলাভ হবে একথা বলে তিনি শিষ্যকে আশ্বস্ত করতে চান নি, বলেছেন সুখদুঃখ দুটোরই অতীত হতে হবে, তবেই যথার্থ স্থায়ী আনন্দ—"সুখং দুঃখস্থ খাত্যয়ঃ।"

সন্তদাসজী চেয়েছিলেন শিষ্যের দুঃখ ও অশান্তির মুল উচ্ছেদ করতে ; সেটা সহজ নয়, তাই সহজ নয় বলেন নি, কারণ সিদ্ধিকে অনায়াসলভ্য বলে সত্যের অপলাপ তিনি কখনো করেন নি, বরং মুনি ঋষিরা কত দীর্ঘ, কঠোর তপশ্চর্যা করতেন সিদ্ধিলাভের জন্য এ কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মন যে সহজে স্থির হয় না, স্থির হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী দৃঢ়-প্রচেষ্টা সাপেক্ষ এ কথা বহু পত্রে উল্লেখ করেছেন। পত্রাবলী পড়তে পড়তে গীতার একটি শ্লোকার্ধ প্রায়ই মনে হয় "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।"

২। অধ্যাত্ম ও সাধন-প্রসঙ্গ। উদ্ধৃত পত্রাংশগুলিতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ; সন্তদাসজীর আচার্যরূপটি এ থেকে কিছুটা পরিস্ফুট হবে।

(ক) বাইরের দর্শনাদির চেয়ে সাধকের আভ্যন্তর অবস্থার ওপর তিনি ঢের বেশি জোর দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতার মূল-অন্তর্মুখীনতা।

(খ) সাধনার লক্ষ্য এবং সাক্ষাৎলভ্য 'ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের নির্মলতার একটি প্রধান লক্ষণ—কোন ব্যক্তি বা কোন কার্যের প্রতি কিছুতেই বিদ্বেষ না আসা। এই লক্ষণটির ওপর সন্তদাসজী খুব বেশি জোর দিয়েছেন।

(গ) নির্মল চিত্তের একটি প্রধান লক্ষণ—অহঙ্কারশূন্যতা ; অহংতত্ত্ব ধীরে ধীরে মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যাওয়া—এইটাই সাধনার নিগূঢ় রহস্য।

(ঘ) চিত্তবিক্ষেপের একটি প্রধান কারণ এবং চিত্তের একাগ্রতালাভের একটি প্রধান অন্তরায়—অন্যের দোষদর্শন। তাঁর সাধন অবস্থার ডায়ারি লক্ষ্য করলেও বোঝা যায় সাধকের পক্ষে এই দোষদর্শন কতখানি মারাত্মক এবং এ অতিক্রম করা কত কঠিন।

(ঙ) চিত্ত নির্মল হলে অনুভূতি হয় এবং তত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

(চ) জন্মান্তরের দুষ্কৃতি দুঃখভোগের দ্বারা ক্ষীণ না হলে সাধনায় বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না, কারণ ভোগ ছাড়া চিত্তের মালিন্য দূর হয় না।

(ছ) কায়িক ও বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভজনের মধ্যে মানসিক ভজনই শ্রেষ্ঠ। মনন ও ধ্যান মানসিক ভজন ; নাম জপ বাচিক ভজনের অন্তর্ভূ'ত এটা লক্ষণীয়।

(জ) সব উপাসনার ফল এক নয়। ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করলেও উপাস্য (বা জীবের) দেবতার শক্তি যতটুকু ততটুকুই উপাসক লাভ করবেন, তার বেশি নয়।

(ঝ) গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ "সাক্ষাৎ" সম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ নয়; এর পরেও সাধনা আছে।

(ঞ) ষট্‌চক্রের কথা তন্ত্রে যা আছে তা সম্পূর্ণ সত্য। অধ্যাত্মিক সাধনার এইটাই পথ এ পথ দিয়ে সমস্ত সাধককেই যেতে হয়।

(ট) প্রার্থনা খুব উপকারী। তবে প্রার্থনা অনেক সময়েই পূরণ হয় না; পূরণ হওয়াটা নির্ভর করে প্রার্থীর চিত্ত কতটা নির্মল তার ওপর।

(ঠ) শেষ দর্শন চাক্ষুষ দর্শন নয়, আত্মজ্ঞান।

৩। গুরুতত্ত্ব পূর্বে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কয়েকটি জিনিষের প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি :—

(ক) পারম্পর্যক্রমাগত সদগুরু-প্রদত্ত মোক্ষবীজ অমোঘ এবং অনধিক তিন জন্মের মধ্যে শিষ্যের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

(খ) গুরুশক্তি এবং ভগবৎশক্তি অভিন্ন; গুরুর প্রসন্নতা লাভ না হলে ভগবৎকৃপা সহজে হয় না।

(গ) শিষ্যের সাধনভজনের স্বতন্ত্র সামর্থ্য কিছুমাত্র নেই, তাও কৃপাসাপেক্ষ। গুরুর উপদেশমাত্র গ্রহণ করে সাধন ভজন নিজেই করব—এ মনোভাব কল্যাণজনক নয়; এরূপ ধারণা যে শিষ্যের হয় তাঁর পক্ষে "কৃত-কৃত্যতা লাভ করা অতি কঠিন।"

(ঘ) প্রবৃত্তিমার্গের গুরুর কাছে দীক্ষা এবং নিবৃত্তিমার্গের গুরুর কাছে দীক্ষা—দু'এর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

(ঙ) চিত্ত নির্মল না হলে গুরুর নিত্য সান্নিধ্য অনুভবগোচর হয় না।

(চ) গুরুর "মনুষ্যভাব" এবং ভগবদ্ভাব যুগপৎ বিদ্যমান।

৪। সর্বশেষ পত্রটি পূজ্যপদে শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাসজী মহারাজকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এই মন্ত্রোপম পত্রটির একটি আশ্চর্য শক্তি আছে, পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য

করবেন। "অনন্তজীব-সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড" ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কাছে কি ভাবে প্রতিভাত হয় এখানে তার কিছুটা অভাস পাওয়া যাবে। সন্তদাস স্বামীজী বারবার বলেছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই হচ্ছে চরম অনুভব এবং শেষ কথা। এই পরম তত্ত্ব স্বয়ং পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, এই বিষয়ে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা অনুভব করিতে সদা যত্ন করিবে"—এই কথাটা এতটা জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-সম্ভূত নিঃসংশয় দৃঢ়তাই এই আশ্চর্য পত্রটির অপূর্ব বস্তু।

শান্তি-সোপান

নিজের ইচ্ছা যেরূপ হয় তাহাও ভগবান পূরণ করিয়া দেন, তদ্দারা যে আনন্দ লাভ হয় তাহা যথার্থ শান্তি নহে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ দর্শন করিয়াও যাঁহার মনের শান্তির ব্যাঘাত জন্মে না, তিনিই অবিচলিত শান্তি লাভ করিতে পারেন।

(পত্রাবলী ২-পৃ৫)

* * *

যে কার্য্যকে মহৎ দোষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রথমে প্রবৃত্তি জন্মে, পরে সেই কার্য্যের প্রতি আর তদ্রূপ তীব্র বিদ্বেষ থাকে না, এবং তাহা উপেক্ষা করিতেই শিক্ষা করেন। যাঁহার চিত্ত এইরূপ হইয়াছে যে, ধৈর্য্য কিছুতেই চ্যুত হয় না এবং অন্যের কৃতকর্ম্মের প্রতি আর বিদ্বেষ বুদ্ধি আসে না, তাঁহারই চিত্ত নির্ম্মল

হইয়াছে বলা যায় এবং তিনিই যথার্থ শান্তি লাভের অধিকারী হয়েন। বস্তুতঃ এইরূপ সকলের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিরহিত যিনি হয়েন, যিনি অন্যের কার্য্যে দোষ দর্শন করিয়া অশান্তচিত্ত না হয়েন, তিনিই যথার্থপক্ষে একান্ত বাস এবং ধ্যানাবলম্বন পূর্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইতে যোগ্য হয়েন। সংসারে কাহারও প্রতি অথবা কোন কার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিবিহীন যিনি না হইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র নির্জনবাস এবং একাগ্রভজনের অধিকারী হয়েন না।

(পত্রাবলী ১-পৃ১৪)

* * *

জীবের সুখদুঃখ সমস্তই ঈশ্বরের নিয়তির অধীন ; তিনি যখন যেমন রাখেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে জীবনযাত্রা স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন যথার্থ শান্তির আর উপায় নাই। ইহা জানিয়া কোন বিষয়ে আগ্রহান্বিত না হইয়া কর্তব্যকার্য্য অবস্থানুযায়ী করিয়া যাওয়াই শান্তিলাভের উপায় ; এই জানিয়া আমি কোন বিষয়ে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইতে কাহাকেও বলি না।

(পত্রাবলী ২-পৃ১১)

তোমার নিজের কোন কর্ম নাই, যাহা ভগবান করান তাহাই নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া যাইবে। (পত্রাবলী ২-পৃ১৬)

* * *

যেখানে থাক সেইখানেই তোমার মধ্যে (সঙ্গে সঙ্গে) তিনি আছেন, ইহা জানিয়া তুমি তাঁহার স্মরণ মনন করিতে এবং তিনি যে

তোমার সঙ্গে আছেন তাহা অনুভব করিতে অভ্যাস কর; ইহাতে তোমার সমস্ত কামনার মূল ছেদন হইয়া যাইবে ও তুমি শান্তিলাভ করিবে। তিনি তোমার জন্য যে বিধান করেন তাহা তুমি বুঝিতে পার বা না পার তৎসমস্ত তোমার কল্যাণের নিমিত্ত, ইহা দৃঢ়রূপে জানিবে। (পত্রাবলী ২-পৃ১৭)

* * *

যাহা করিতেছ এবং যেরূপ চলিতেছ তৎসমস্তই ভগবদনুমোদিত বলিয়া জানিবে। সুতরাং কোন প্রকার বিষণ্ণ থাকিও না। আনন্দ মনে যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া যাও। ঘরে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলে তাহা কোন প্রকারে নিজের মনে লাগাতে দিবে না, উড়াইয়া দিবে, অগ্রাহ্য করিবে। (পত্রাবলী ২-পৃ৩২)

পরন্তু তুমি উচ্চ সাধন প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার পক্ষে ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ই অনিত্য; কাহারও সহিত এবং কিসেরও সহিত, তোমার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নয়। যে সম্বন্ধ এইক্ষণে আছে, তাহা এক সময়ে নিশ্চয়ই ভঙ্গ হইবে। ইহা জানিয়া কাহার অথবা কিছুরই প্রতি অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত না হওয়াই শ্রেয়স্কর। সকলেরই কল্যাণ ইচ্ছা করিবে, এবং যথাসাধ্য সেবা করিতে চেষ্টা করিবে; এবং বিধাতা পুরুষ যেরূপ বিধান করেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া অন্তিমে প্রকাশ পাইবে, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে!—

(পত্রাবলী ২-পৃ৩১-৩২)

* * *

তুমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে যে জগতে কোন কার্য্য—এমন কি পাপকার্যও আকস্মিক নহে। সাধুজনের পক্ষে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পাপকার্য্যের দ্বারাও তাঁহাদের কল্যাণ অবশেষে সাধিত হইয়াছে। অতএব গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

এই উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখিয়া মনের অবস্থাকে সর্বতোভাবে সর্বদা ভগবৎ নিয়তির অধীন করিয়া শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

—(পত্রাবলী ১-পৃঃ ১২৪)

* * *

সংসারের সুখদুঃখ অল্পদিনের জন্য, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও না। তাঁহার ভজন করিলে পরে যে অনন্ত কাল আছে তাহা আনন্দময় হয়। তুমি সেই দিকে লক্ষ্য করিতে চেষ্টা কর, ইহাই যথার্থ কল্যাণজনক। সময় অল্পই আছে, তুমি ইহার সদ্‌ব্যবহার করিতে যত্ন কর।

(পত্রাবলী ২-পৃঃ ৩৪)

* * *

তোমার যত বয়স হইয়াছে তাহার দ্বিগুন অপেক্ষা অধিককাল আমি সংসারের সেবা করিয়াছি ; মান, যশ প্রভৃতি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অর্থোপার্জনও অনেক করিয়াছি এবং আমার অপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জন করে এমন লোকও অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু শান্তি ও যথার্থ সুখ কুত্রাপি দেখি নাই। এই নিমিত্ত তাহা

পরিত্যাগ করিয়াছি; সংসারে সুখ শান্তি দেখিলে তাহা ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হইত বলিয়া বোধ করি না। (পত্রাবলী ১-পৃঃ ২৬২)

* * *

পরন্তু তুমি সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে সংসার ক্রীড়ার ভুমি মাত্র। ইহার সুখদুঃখ, অভাব প্রাচুর্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এবং বাহিরের জিনিষ; তোমার আত্মাতে এই সকল স্থান পায় না। যখন উপস্থিত হয় তখন তুমি ইহাদের সহিত একাত্মবুদ্ধি হইয়া যাও এবং নিজেকে সুখী, দুঃখী, ক্ষতিগ্রস্ত, লাভবান্ বলিয়া মনে কর; কিন্তু সেই সকল সুখ-দুঃখের লাভক্ষতির অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর তোমার নিকট ঐ সকল স্বপ্নবৎ বোধ হয়। রোগ চলিয়া গিয়া শরীর সুস্থ হইলে পরে রোগের বিষয় স্মৃতিতে আসিলে তাহা দুঃখ দেয় না, স্বপ্নবৎ বোধ হয়। বাস্তবিক সর্বদা এই সমস্ত অবস্থার অতীত বলিয়া সর্বদা মনে ধারণা করিতে যত্ন করিবে। যেমন পাশা খেলাতে কাহারও হার, কাহারও জিত হয়, বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিকট খেলায় হারও খেলাই থাকে, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি খেলায় হারকেও দুঃখের কারণ বোধ করে। সাংসারিক লাভক্ষতিও এইরূপই জানিবে। এই সংসারের খেলা অতি অল্পদিনের বিষয়, অনন্তকালের তুলনায় ইহা সমুদ্রে বিন্দুবৎও নহে। অতএব এখানকার লাভক্ষতি বুদ্ধিমান্ পুরুষকে ব্যথিত করে না। আর ইহা জানিবে যে, যতদিন পরমায়ু আছে, ততদিন এই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার্য বস্তু কোন না কোন সূত্রে ভগবান্ দিবেনই। যে দিন অন্ন তিনি জুটাইবেন না সেদিন অতি ধনী ব্যক্তিকেও উপবাসী থাকিতে হইবে। অতএব তন্নিমিত্ত চিন্তা না করিয়া বীরের মত

সংসারের খেলা খেলিয়া যাও, কোন ক্ষতি অথবা বিপদকে তোমার নিজের ক্ষতি অথবা বিপদ্ বলিয়া মনে করিবে না, ইহা খেলায় হার হওয়ার মত গন্য করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।—

(পত্রাবলী ১—পৃঃ ১১৮-১৯)

* * *

দেহধারীর পক্ষে দুঃখের কারণ উপস্থিত হইবে না ইহা হইতে পারে না। দুঃখের কারণ উপস্থিত না হওয়ার নাম কল্যাণ নহে। সুখদুঃখে সমচিত্ততা লাভ করাই যথার্থ কল্যাণের আকর। সংসারে আসিয়া সকলকেই মরিতে হয়; বৃদ্ধ হইয়া মরিলেও নিজের এবং অপরের শোক হয়। এই মৃত্যুরূপ মহৎ কষ্ট হইতে অব্যাহতি এক আত্মজ্ঞ পুরুষই পাইয়া থাকেন, অপরে নহে।—

(পত্রাবলী ২—পৃঃ ১৬৩)

অধ্যাত্ম ও সাধন প্রসঙ্গ

যদি ভগবানের ভজন এই শরীরের দ্বারা কিছু না হয় তবে কেবল আহার-নিদ্রার জন্য শরীর থাকিলেই কি অধিক স্বার্থ, গেলেই বা কি অধিক ক্ষতি ?—(পত্রাবলী ২—পৃঃ ২৫৭)

* * *

আর ঠাকুরকে পূজা কর কি কেবল সংসারের ভোগ বিষয়ে উন্নতির নিমিত্ত ? ইহা ত প্রকৃত ভক্তি নহে, এক প্রকার

দোকানদারী। ভগবান্‌কে যে চায়, তাহাকে ত অপর সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ অন্তরে ফকির হইতে হয়, তবে ত তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভাগবতের একটি শ্লোকের অনুবাদ বাঙ্গালায় একজন নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন :—

ভগবান বলিলেন—"যে করে আমার আশ, তার করি আমি সর্বনাশ। তবুও যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসের দাস॥"

বাইবেলেও বলিয়াছেন, "He is a jealous God বড় পরীক্ষা করেন আর কিছু চায় কি না—(পত্রাবলী ২—পৃঃ ২৯, ১২১)

* * *

ভগবদ্‌ভক্তি লাভই মনুষ্য জীবনের মহৎ লাভ; তৎপ্রতিই লক্ষ্য রাখিবে। ভজন করিতে করিতে বাহিরের কিছু কিছু শক্তি সময় সময় প্রকাশ পায়, ইহা সত্য কিন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ভক্তিলাভ হয় না। এই কথা সর্বদা মনে রাখিবে।

আমাদের পন্থা এই যে, সর্বভূতে ভগবৎ-সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। সর্বজীবরূপই ভগবানের রূপ। যতদিন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে ততদিন সমস্ত ভূতে ভগবৎসত্তার ধ্যান করিবে, এবং নিজে সকলের সেবক হইয়া আচরণ করিবে। ইহাই একমাত্র বিচার, ইহাই একমাত্র নিজের সম্বন্ধে কর্তব্য।—(পত্রাবলী ১—পৃঃ ৭০)

* * *

ভগবৎ-নির্দিষ্ট পন্থায় ত সকল জীব চলিতেছেই; কিন্তু এই বিষয়ের জ্ঞান উদ্দীপনের নিমিত্তেই ভজন; ভজনের ফলে ক্রমশঃ এই

জ্ঞান উদিত হয়। এই নিমিত্ত যে যে পথে সংসারমার্গে চলুক না কেন, সর্বত্রই ভজনের আবশ্যকতা আছে। তবে ভজন করা মাত্রই অথবা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সমস্ত কার্য এই ঈশ্বরাধীন এই কথা শুনিবামাত্রই সেই জ্ঞান স্থায়ী হয় না। বহুদিন সাধন ও মনন করিতে করিতে ইহা পাকা হইতে থাকে।—

(পত্রাবলী ১—পৃঃ ৮৬)

ভগবানের ভজন ত্রিবিধ উপায়ে হইয়া থাকে : কায়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা। প্রথমতঃ—সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ পরিক্রমা, জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকা প্রভৃতি; ইহা শরীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ—ভগবানের নাম জপ, তাঁহার স্তুতি পাঠ প্রভৃতি, বাক্যের দ্বারা ভজন। তৃতীয়তঃ—মনঃসংযম, তাঁহার ধ্যান ও চিন্তন মানসিক ভজন।

এই প্রত্যেক প্রকার ভজনের উপকারিতা আছে। সম্পূর্ণ তিনটির দ্বারা ভজন সাধিত হইলে শীঘ্র ফললাভ করা যায়। ইহার কোন অঙ্গের ত্রুটি হইলে বিলম্বে ফলের প্রাপ্তি হয়। এই তিনটির মধ্যে মানসিক ভজনই শ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন অপর দুইটি ভজন হইলে তাহাও নিষ্ফল হয় না, বিলম্বে ফল সিদ্ধি হয়। ভগবৎপ্রসন্নতা লাভই ভজনের ফল। কিন্তু সাধকের চিত্ত যে পরিমাণে নির্মল হয় সেই পরিমাণেই ভগবৎকৃপার স্রোত তৎপ্রতি হয়। পূর্বোক্ত মানসিক ভজন যাহার হয় না তাহার চিত্তের নির্মলতা অপর দুই সাধনের দ্বারা সাধিত হয়। সুতরাং তৎপ্রসন্নতাসূচক কৃপাস্রোত তাহাতে শীঘ্র প্রবাহিত হয় না।—(পত্রাবলী ১—১৭৭-৭৮)

প্রথম উপায়ের তত্ত্ব গুরুমুখে জ্ঞাত হইয়া সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তির উদয় হয়। যাঁহার প্রতি ভক্তি হয় তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হইলে কাহার প্রতি ভক্তি হইবে? এই প্রকার জ্ঞান পূর্বে হয়, তৎপরে ভক্তি সঞ্চারিত হয়; ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে হয় তাহা ত তোমাকে বিশেষ রূপে বলিয়া দিয়াছি। ভগবান্ সর্বাতীত হইয়াও সর্বময়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল ঘটে ঘটে তিনি বিরাজমান আছেন। ইহা জানিয়া সকলের নিকট অবনত মস্তক হইয়া যথাসাধ্য সেবা করিবে। (১ম খণ্ড—পৃঃ ৭৬

* * *

ইহা নিশ্চয় জানিবে—গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া নিজের প্রতি সর্বদা ভগবদ্দাসবুদ্ধি রাখিয়া আলস্য বর্জন পূর্বক সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া যদি জাগতিক সকল জীবের সেবা কেহ করে, তবে তদ্দ্বারাই উচ্চগতি লাভ করিতে পারে। সমস্ত জাগতিক জীবই ভগবানের অঙ্গ প্রসূত। সকল ঘটে তিনিই বিরাজমান আছেন, ইহা জানিয়া কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব না রাখিয়া যদি সকলের সেবা প্রীতিপূর্বক করা যায়, তবে ভগবান্ তাহাতে শীঘ্র প্রসন্ন হন।

(পত্রাবলী ২য় খণ্ড—পৃ ১৫০)

* * *

তুমি নিয়ত এই একটি সাধন অভ্যাস করিতে যত্ন কর; অবশ্য ইহা অতি কঠিন অভ্যাস্ করিতে যত্ন সর্বদাই করা উচিত এবং এইরূপ যত্নেও ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন। সেই সাধনটি এই। ভগবান্‌কে

প্রত্যেক জীবের (মায় তোমার) প্রত্যেক কার্য্যের নিয়ন্তা, সুতরাং প্রত্যেক জীব যে কার্য্য করিতেছে, তাহা তাঁহারই প্রেরিত, সুতরাং তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি রক্ষা করা অকর্তব্য। এক কথায় কাহারও কার্য্যকে দোষ দৃষ্টিতে দর্শন করিবে না। এই একটি কথা স্মরণ রাখিলে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি সকল বিষয় হইতে তুমি নির্লিপ্ত হইবে। অবশ্য বাহিরে কার্য্য করিতে যে যে স্থলে যেরূপ কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে অবধারণ করা হইয়াছে তদ্রূপ কার্য্য করিবে, কিন্তু ইহা থিয়েটারের acting-এর মতন কার্য্য, তাহাতে নির্লিপ্ততা থাকে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে তুমি কদাপি মোহে পতিত হইবে না। —(অপ্রকাশিত পত্রাবলী—পৃঃ ২৫)

ভগবদ্বিগ্রহমূর্তি দেখিলে যেমন ভক্তির উদয় হয়, তৎসমীপে নম্রতা আসে, তদ্রূপ যিনি সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করিতে অভ্যাস করেন, এবং নিশ্চিত রূপে জানেন যে বিগ্রহমূর্তিতে যেমন ভগবান আছেন, অপর সমস্ত দেহেও তিনিই তদ্রূপ আছেন, তিনি সকলের নিকট নম্র না হইয়া কিরূপে অহঙ্কৃত হইবেন ? অপরের দোষ দর্শন হেতু তৎপ্রতি অবজ্ঞা আসে। যিনি সর্বত্র ভগবদ্দর্শন করিতে যত্ন করিবেন, তাঁহার পক্ষে দোষদর্শনের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং অবজ্ঞার ভার আর আসে না, মর্য্যাদাবুদ্ধি সর্বত্র স্থাপিত হইতে থাকে। —(পত্রাবলী ১-পৃ২১৪-১৫)

★ ★ ★

দোষ সকলেরই আছে। তোমার নিজেরও অনেক দোষ আছে। তুমি যদি অপরের দোষ দেখিয়া রাগ কর, ক্ষমা না কর,

তবে তোমার দোষ ভগবান কিরূপে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা করিতে পার? এই কথা সর্বদা মনে রাখিয়া ক্ষমাবৃত্তি যাহাতে সর্বদা ধারণ করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। আর ব্যবহারে সর্ব্বদা সরল সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করিবে।

—(পত্রাবলী ২-পৃ১৭৯)

* * *

আর ইহাও জানিবে যে সাধারণ ব্যবহারে যে পরিমাণে নিষ্কপটতা, সরলতা এবং স্বার্থশূন্য প্রীতির ভাব অন্তরে উদয় হয় সেই পরিমাণেই চিত্ত যথার্থ নির্মল হইয়াছে। এই লক্ষ্য অন্তরে সর্বদা রাখিবে।—(পত্রাবলী ১—পৃঃ ১৭৩)

* * *

বৎস উপস্থিত হইলেই গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। বৎসভাবাপন্ন পাত্র ভিন্ন অপরের নিমিত্ত দুগ্ধ ক্ষরিত হয় না। বিধাতা এইরূপ পাত্রকেই, যাহা লোকে "বিশেষ অনুগ্রহ" করা হইলে বলে, তাহা করিয়া থাকেন, অন্যথা করিতে পারেন না। ইংরাজিতে আছে, "Heaven helps those who help themselves—ইহা সত্য। যাহারা আলস্য-বর্জিত হইয়া প্রাণপণে কর্মচেষ্টা করে তাহাদিগকে উন্নতিশীল দেখা যায়, এবং ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যাহারা খুব ভজননিষ্ঠ হয়, তাহারা অন্য কর্মচেষ্টা না করিলেও তাহাদের অভাব সকল বিধাতা পুরুষ সর্বদা পূরণ করেন। অতএব হয় আলস্য-বর্জিত কর্ম্ম-চেষ্টা, নতুবা নিষ্কাম হইয়া ভজনে নিষ্ঠা

ব্যাতিরেকে কেহ অভাবমুক্ত হইতে পারে না জানিবে। এই ত তোমাকে সার সত্য বলিলাম।—(পত্রাবলী ২—পৃঃ ২০২-৩)

* * *

সাধক লোকের অহঙ্কার বর্ধিত হইবার অনেক কারণ উপস্থিত হয় ; যাহার প্রতি ভগবৎ কৃপা বিশেষরূপে হয় তাহার সাংসারিক অভাব রাখিয়া অহংকারকে দমন করিয়া রাখেন এবং ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেন। সম্পদের সময় ভগবানকে স্মরণ করা কঠিন। তুলসীদাসজী বলিয়াছেন—"দুঃখ যে হরি ভজে সব কোই, সুখমে না ভজে কোই। সুখ্‌মে যো হরি ভজে উস্‌কা দুঃখ না হোই।"

ইহাই যথার্থ পরীক্ষা। যাহার সম্পদে ভগবদ্ভজনকে ভুলাইয়া না দেয়, তাহাকে ভগবান্ নানাবিধ সম্পদ দেন। আর যাহার প্রতি কৃপা আছে তাহার যদি সচ্ছলতার সময় ভজনের অভাব হয় তবে তাহকে সচ্ছলতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অনহংকৃত বিনীত ভক্ত হইতে শিক্ষা দেন। ইহা মনে রাখিবে যে সুখদুঃখ বাহিরের জিনিষ, আত্মার নহে। এই ভাবিয়া তৎপ্রতি সমবুদ্ধিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ ভক্তি হয় না।

* * *

ক্রমশঃ ক্রমশঃ শ্রীভগবৎকৃপায় বুঝিতে পারিবে যে, তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্যে তাঁহার হাত আছে। যে পরিমাণে ইহা বুঝিতে পারিবে সেই পরিমাণে নিজ কর্তৃত্ববুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে। ভক্তিপূর্বক ভগবৎনাম সাধন করিতে থাক, তাহাতে চিত্ত নির্মল

হইবে এবং যে পরিমাণ নির্মল হইবে সেই পরিমাণে কর্তৃত্বাভিমান পূর্বোক্ত প্রকারে দূর হইতে থাকিবে।—(পত্রাবলী ২—পৃঃ ১৭০)

* * *

ভগবান্ এবং গুরু যে সন্নিধানে থাকেন তাহা চিত্ত নির্মল না হওয়া পর্যন্ত অনুভব করিতে পারা যায় না। ভজন করিতে করিতে এবং সকল জীবের প্রতি সুহৃদ্ভাবাপন্ন হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে ইহার অনুভব হইতে থাকে। আর ইহা স্মরণ রাখিবে, আত্মার কল্যাণ কোন কার্যের দ্বারা হইলেই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তখনই অনুভবের বিষয় হয় তাহা নহে। গঙ্গাস্নান তীর্থসেবাদি কার্য্য নিশ্চয়ই কল্যাণ সাধন করে। যাঁহাদের চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্মল হয়, তাঁহারাই গঙ্গাদির পুণ্যস্পর্শজনিত উপকার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অপর লোকে অনুভব করিতে না পারিলেও যে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তুমি ভজন করিতে থাক, চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল হইলে এই সকল বুঝিতে পারিবে। —(পত্রাবলী ১—পৃঃ ২০৩)

* * *

প্রার্থনা খুব উপকারী। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্ পুরুষেরই আপৎকালে অথবা অভাব প্রভৃতি স্থলে যথার্থপক্ষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি হয়। ভগবান্‌কে যিনি আপন বোধ করেন তিনি সর্বদা নিকটে আছেন, এবং দুঃখ দূর করিতে সমর্থ—ইহা যিনি অন্তরে ধারণা করিয়াছেন, তিনিই অভাব সকল ভগবান্‌কে জ্ঞাপন করেন। জ্ঞাপন করা কালে ভগবৎ-সান্নিধ্যবোধ তাঁহার

নিশ্চয়ই জন্মে। অতএব ইহা তাঁহার বিশেষ কল্যাণ লাভের হেতু হয়। তাঁহার প্রার্থনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বদা পূরণ ভগবান্ করেন না সত্য, কারণ তাঁহার প্রার্থনা নিজের এবং জগতের যথার্থ কল্যাণের নিমিত্ত না হইলে তাহা সফল হওয়ার যোগ্য নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রার্থনা সর্বদা পূরণ না হইলেও চিন্তার দ্বারা এক প্রকার ভগবৎ-সঙ্গ লাভ হয়। তাঁহাতে জীবের চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে এবং ইহা তাঁহার অশেষবিধ কল্যাণের হেতু হয়। যাহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাঁহাদিগের কোন প্রার্থনা হৃদয়ে উদিত হইলে, তাহা কল্যাণের মূলেই উদিত হয় এবং তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পূর্ণও হইয়া থাকে ; ইহাতে ভগবানের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। চিত্তের শুদ্ধির উপরেই ইহা সাধারণতঃ নির্ভর করে।—

(অপ্রকাশিত পত্রাবলী—পৃঃ ২

রোগ, শোক প্রভৃতি জন্মান্তরের কর্মের ফল ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই সকল ভোগের দ্বারাই জন্মান্তরের দুস্কৃতি কাটিয়া যায়। এই সকল দুস্কৃতি কাটিয়া না গেলে চিত্তের মলিনতা দূর হয় না এবং ধর্মরাজ্যে বিশেষ রূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। ইহা নিশ্চিত সত্য জানিবে।

—(পত্রাবলী ১-পৃ১২০-২১)

★ ★ ★

যে যে কর্ম ভগবান যাহার দ্বারা করাইবেন তাহা তিনি জন্মকালে অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা করিতেই হইবে।—

(পত্রাবলী ২-পৃ২৫৯)

*　　*　　*

যাহার নিমিত্ত যে স্থানে যেরূপ কর্ম তিনি অবধারিত করিয়াছেন তাহাকে সেই স্থানে থাকিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে। ভজন সাধন বিষয়েও কাহারও স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই। তিনি আবশ্যক মত সময় অনুসারে সমুদয় প্রয়োজনীয় কর্ম করাইয়া লইবেন।… …যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি কাহার দ্বারা কিরূপ কর্ম করাইবেন তাহার তত্ত্ব তিনিই অবগত আছেন। ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই।

(পত্রাবলী ১-পৃ২৩৯)

*　　*　　*

ধীরে ধীরেই চিত্ত নির্মল হয়। যাদুবিদ্যার দ্বারা যেমন তাড়াতাড়ি ফল হইতে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ ফল হইতে কদাপি দেখা যায় না; কারণ অনন্তকালের সংস্কার চিত্তে বসিয়া আছে, তাহা ক্ষালিত হইতে বহু বিলম্ব লাগে। এক জীবনে যাহাদের হইয়া যায় তাহারা অতি ভাগ্যবান্।— (পত্রাবলী ২-পৃ১৮৩)

*　　*　　*

শতদিকে সর্বদা সাধকের মন ধাবিত হইতেছে; মন্ত্রশক্তি এবং সাধনের দ্বারা এই চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া এক ভগবন্নিষ্ঠ হয় এবং

এইরূপ হইলেই ইহাকে ঐকান্তিকতা বলে। ঐকান্তিকতা লাভ করা মুখের কথা নহে। বহু সাধনের ফলে তাহা ঘটিয়া থাকে।

(পত্রাবলী ১-পৃ১০০)

*　　*　　*

অহঙ্কার অভিমান যত দূর হয় ততই কল্যাণ বলিয়া জানিবে। এই অহংকার অভিমান দূর করাই সাধনভজনে প্রধান ফল বলিয়া জানিবে।　(পত্রাবলী ১-পৃ১৮২)

*　　*　　*

সাধকের পক্ষে অহংকার সর্ব্বপ্রকারে বর্জন করা চাই। সর্বদা স্থির বুদ্ধিতে থাকিয়া সকলের প্রতি বিণীত ভাব অন্তরে পোষণ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ যথাসাধ্য যত্ন করিলেই নিশ্চয় অজস্র ভাবে ভগবৎ কৃপাবর্ষণ হইতে থাকিবে। তাহাতে অন্তরে আনন্দের অভাব হইবে না।—　(পত্রাবলী ২-পৃ১৬৭)

*　　*　　*

প্রত্যেক জাগতিক বস্তু—প্রত্যেক জাগতিক জীব—কোন বিশেষ শক্তিময় এবং ইহাদিগের মধ্যে শক্তির প্রভেদ অনন্ত প্রকারের। কোন এক বিশেষ বস্তু (জীবকে) ইষ্টরূপে উপাসনা করিলে সেই জীবে প্রকাশিত শক্তি সাধকে সঞ্চারিত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলেও সেই উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। ধ্যেয় বস্তু অথবা জীবেতে যে শক্তি আছে, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাল

করা যায়। ....অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে এই সীমাবদ্ধ শক্তিযুক্ত বস্তু—সাধারণ জীব অথবা দেবতাকে অভীষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া শাস্ত্রের উপদেশ নহে। ভগবানের যে বিশেষ মূর্তিতে তিনি জীবকে পারগামী করিবার শক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন সেই মূর্তিকেই অভীষ্টরূপে অর্চনা করিলে জীব তদগত শক্তি লাভ করিয়া পারগামী হইতে পারেন। এই জগৎ সৃষ্টির প্রসারণ করিতে ভগবান ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়াছেন, রুদ্র তাঁহার সংহার মূর্তি। বিষ্ণু জগতের স্থিতি কারণ এবং তিনি জগতের কল্যাণ বিধান করেন ও জীবকে পারগামী করিয়া থাকেন। ইহা সর্বশাস্ত্র সম্মত। প্রকাশিত জগতে ইনি সত্ত্ব গুণের অধিপতি। সত্ত্বগুণই তাঁহার দেহ রূপে কল্পিত হয়। নির্ম্মল সত্ত্ব গুণের ভিতর দিয়া না গিয়া কেহ গুণাতীত বস্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। ইহাই সর্বশাস্ত্রের উপদেশ। সুতরাং মোক্ষার্থী ব্যক্তি সত্ত্ব গুণময়বপু বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। "মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ" বাক্যে ইহা ঋষিগণ স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন। —(পত্রাবলী ১-পৃ৯৪-৯৬)

* * *

কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী নারায়ণী বলিয়া নমস্য হয়েন। বৈষ্ণবের ইষ্ট বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী। দেবী কালী তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন। ...সমস্ত প্রকাশিত রূপই বিষ্ণুর রূপ। এই বুদ্ধিতে সকলকে দণ্ডবৎ করিবে। দেবী কালিকা স্বয়ং বিশ্বোদরী, তাঁহার

খাদ্যাখাদ্য কি ? ...তিনি সামর্থ্যী, অতএব জীব-রক্তমাংস গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছু বিকার হয় না। তিনি মাংসাদি গ্রহণ করেন বলিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। অপর ফল মূলাদি প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন।— (পত্রাবলী ১-পৃ২৩৫-৩৬)

* * *

গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষপ্রদ নহে ; ইহা অতিশয় কল্যাণকর সন্দেহ নাই। গায়ত্রী দেবীও বিষ্ণুভক্তিরই উদ্দীপনা করিয়াছেন, অবশ্য মোক্ষার্থীকেই করেন, অপরকে না। আমার পূজনীয় গুরুদেব প্রথমেই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারিবে। কিন্তু তৎপরে দীর্ঘকাল বহু সাধন করিবার পর ভগবৎ সাক্ষাতকার লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। এই পদ তাঁহার গায়ত্রীসিদ্ধি দ্বারা পূর্বে হয় নাই।— (পত্রাবলী ১-পৃ৬৩)

* * *

তন্ত্রে যে ষটচক্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আধ্যাত্মিক সাধনের ইহাই স্বাভাবিক পন্থা—ইহার ভিতর দিয়া সকলকেই যাইতে হয়। কিন্তু যাইবার প্রণালী বহু প্রকারের আছে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই ষটচক্র বিদ্ধ করা। রাজযোগ, যাহা কেবল ধ্যানাত্মক, তাহার ফলেও ষট-বিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ রাস্তায় চলিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাহাদের অধিকাংশেরই বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহাদের

বীর্য্যধারণ নাই, তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও ক্ষয়রোগ হয়, কেহ উন্মাদ হইয়া যায়, কেহ গ্রহনী প্রভৃতি উৎকট রোগে আতাঁন্ত হইয়া বহু কষ্ট পাইয়া থাকেন। তোমরা যে সাধন পাইয়াছ, নিষ্ঠাপূর্বক সে সাধন অবলম্বন করিলে তদ্দারা অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন ব্যতীতই ষটচক্রের রাস্তা সম্পুর্ণ খুলিয়া যায়।—

(পত্রাবলী ১-পৃ১৮৭-৮৮)

* * *

তোমাদের মধ্যে কাহারও এক জন্মে মুক্তি ঘটিবে; কাহারও তিন জন্ম পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটিতে পারে। সকলের পশ্চাতেই আমার গুরুদেব আছেন জানিবে। আমার দেহ অবলম্বন করিয়া তিনিই চেলা করিতেছেন।—

(পত্রাবলী ১-পৃ৪৭)

* * *

ভজনের সময় যে সব দৃশ্য দেখিতে পাও, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। দেহে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই ছবি আছে। তাহার কোন অংশ কখনও চোখের সম্মুখে খুলিয়া যায়। ইহা আশ্চর্য নহে জানিবে।

—(পত্রাবলী ১—পৃ ১৮২-৮৩)

* * *

ভজনের সময় জ্যোতিদর্শন হয় এবং একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাও লিখিয়াছ। এই সকল সময় সময় হইয়াই থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে না। শ্রীভগবৎ ধ্যানে, শ্রীভগবৎ নাম স্মরণে এবং শ্রীভগবৎ প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেই সর্বদা যত্ন করিবে।

যে পরিমাণে ইহাতে মন নিবিষ্ট হইবে সেই পরিমাণেই ভজনের উন্নতি জানিবে। আলোকাদি দর্শনকে বাহিরের জিনিষ বলিয়া জানিবে। —(পত্রাবলী ১—পৃ ১৭৩)

*　　*　　*

ভগবান্ যে কোন মূর্তিতে সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন তাহা যে তাঁহার মূর্তি তাহা সাধককে কৃপা করিয়া অন্তরে পরিচয় করিয়া দেন। জগতের বিশেষরূপ মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত তিনি যে বিষ্ণুরূপ বিশেষ মূর্তি সদা ধারণ করিয়া আছেন সেই মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া কৃপাপূর্বক কোন কোন ভক্ত সাধককে চাক্ষুষ দর্শন দেন। ইহাই চাক্ষুষ দর্শনের পরাকাষ্ঠা। আত্মরূপে যে সর্বশেষ দর্শন তাহা চাক্ষুষ দর্শন নহে, তাহা আত্মজ্ঞান ; ইহা হইলে পরমমোক্ষ পদ লাভ হয়।

—(পত্রাবলী ২—পৃ ১৯৭-৯৮)

গুরু-তত্ত্ব

ইহা মনে রাখিবে যে নিজের মনে যাহা উদয় হয় তাহাই যে করিয়া থাকে তাহাকে সাধুগণ গোয়ার বলেন। কথায় বলে—"মনমুখী গোয়ারা। গুরুমুখী ভগবৎ প্যারা॥" যাহারা মনমুখী হইয়া কার্য্য করে তাহারা ক্লেশই পায় জানিবে।—

(পত্রাবলী ১-পৃ২৭০)

*　　*　　*

যথার্থই কল্যাণার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, সদগুরুর শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন করিয়া দেয় এবং নিজে কিছু মাত্র বিচার না করিয়া সদ্‌গুরুর আদেশ মাত্র প্রতিপালন করা জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে; এইরূপ যিনি করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্মবন্ধন হইতে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

আপনাতে কর্তৃত্ব বুদ্ধি যাঁহার আছে, যিনি নিজে সাধন করিয়া পারগামী হইবেন মনে করেন এবং গুরু হইতে কেবল উপদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেই সাধন ভজন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন বলিয়া মনে করেন, তিনি অদূরদর্শী প্রাকৃত শিষ্য। তাঁহার কৃত কৃত্যতা লাভ করা অতি কঠিন। বর্তমান কালে জীব পাঁচ মিনিট কালও চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হয় না। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কিরূপে এইরূপ চিত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে?

(পত্রাবলী ২-পৃ২৬৯)

* * *

গুরুবাক্য পালন করিলে ভগবানের দয়া আপনা হইতে আসিতে থাকে, নতুবা সহজে আসে না তাহা জানিবে॥

(পত্রাবলী ২-পৃ১১৫)

* * *

আশ্রিত শব্দের অর্থ যিনি আশ্রয় করিয়াছেন। যিনি নিজের নিজত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজের উপর নির্ভর না করিয়া, গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। যাহার কোন কার্য্যে অভিমান নাই, আদেশ প্রতিপালন করাই যাহার জীবনের সার, তিনি তো মুক্তই হইয়াছেন,

তাঁহার ইহলোকে কর্মবশে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। যমদূতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক হয় না।— (পত্রাবলী ১-পৃ৬৭)

* * *

সদগুরু দীক্ষার দ্বারা নির্বাণবীজ বপন করেন। তাহা অঙ্কুরিত হইতে পাত্রভেদে বিলম্ব হয়। উত্তম কর্ষিত মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে, তদ্রূপ ভূমি না হইলে বিলম্ব হয়। সংস্কার সকল এবং কর্মের অভ্যাস সকল বীজের স্ফোটন বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে; কিন্তু বীজ অক্ষয় বীজ; ইহা তদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; ক্রমশঃ সংস্কারের বাধা সকল অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে নিজ বল প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাই সত্য জানিবে যে সকল কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস থাকে, সেই সকল দ্বারাও অন্তিমে সাধকের কল্যানই সাধিত হয় দেখা যায়। সেই সকল অভ্যাসের ফল যাহাতে সাধকের পক্ষে কল্যাণজনক হইয়া উঠে, তদ্রূপে সেই বীজ সকল সংস্কারের উপর নিজ শক্তি প্রয়োগ করে। অতএব নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই জানিবে। (অপ্রকাশিত পত্রাবলী-পৃ৪-৫)

* * *

সদ্‌গুরু লাভ হইলে ভববন্ধন কালক্রমে অবশ্য মুক্ত হইবে। এবং ইহাতে সম্পূর্ণ সত্য যে—সদ্‌ লাভ মাত্রই সংসার-বন্ধনের মুল ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু বলবান্ বৃক্ষের মূল কর্তন করিয়া দিবার পরেও অনেক দিবস পর্যন্ত তাহার ডাল ও পাতা প্রভৃতি তাজাই থাকে। মূল হইতে যে রস কর্তনের পূর্ব্বে শাখা ও

পাতাতে সঞ্চারিত হইয়াছে সেই রস শুকাইতে যতদিন বিলম্ব হয় ততদিন পর্য্যন্ত বৃক্ষ তাজাই থাকে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ মহৎ-পাপ প্রবৃত্তি-যুক্ত পুরুষ সদ্‌গুরুর কৃপা পাইলেও তাহার পূর্বানুষ্ঠিত পাপের শক্তি তাহাকে বহু দিন চালিত করিয়া কষ্ট দেয়।.........

মৎস্যকে যেমন বড়শী বিদ্ধ হইবার পরই পারস্থিত পুরুষের হস্তগত বলা যায়, অথচ সে জলেই সন্তরন করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরু-শক্তির দ্বারা শিষ্য বিদ্ধ হইবার পর হইতেই সংসারে থাকিলেও শিষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা সম্পুর্ণ সত্যও বটে। কারণ বৃক্ষের মূল ছেদন হইয়া গেলে বাহিরে সে জীবিত থাকিলেও বাস্তবিক সে মৃতই হইয়াছে। তদ্রূপ সংসারে ভোগের মধ্যে থাকিলেও শিষ্য মূলতঃ মুক্ত হইয়াছে। অপর গুরু সম্বন্ধে তাহা নহে। কারণ মুক্তি তাহাদের আয়ত্ত নহে। সদগুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত শিষ্য অনধিক তিন জন্মে সংসার-সম্বন্ধ-রহিত অবশ্য হইবে। কিন্তু অপর গুরুর শিষ্য অনবরত সংসার-মার্গে প্রবর্তিত হইবে। স্বর্গাদি স্থানলাভ তাহাদের হইতে পারে; কিন্তু তথায় ভোগান্তে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে। জলে বড়্শীবিদ্ধ মৎস্য বিচরণ করে, অপর মৎস্যও বিচরণ করে—দেখিতে একই প্রকার, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেইরূপ সদ্‌গুরুর শিষ্য এবং অপর মনুষ্যও সংসারে আছে, দেখিতে প্রভেদ নাই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কোন স্ত্রীলোক যখন প্রথমে গর্ভধারণ করে, দেখিতে

তাহার সহিত অপর স্ত্রীলোকের প্রভেদ নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।—

(অপ্রকাশিত পত্রাবলী পৃ-৫-৮)

* * *

গুরুশক্তি যে একমাত্র ত্যাগী পুরুষকেই আশ্রয় করে এইরূপ নহে ; গৃহস্থ যদি নিবৃত্তিমার্গের শক্তিলাভ করিয়া থাকেন তবে তিনি শিষ্যকে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে কিছু দোষ হইবে না। সেই শিষ্যও নিবৃত্তি সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে।…যে ঘট যেরূপ নির্মল সেই ঘটে ঐ গুরুশক্তি তদ্রূপ প্রকাশিত হইবে। স্বভাবতঃ অধিক নির্মল চিত্ত হইলে গুরুঘটে যদ্রূপ গুরুশক্তির প্রকাশ আছে তদপেক্ষা প্রকাশ শিষ্যের ঘটে হইতে পারে। গুরুপরম্পরা বিচার করিলে সর্বত্রই দেখিবে যে মধ্যে কোন কোন স্তরের পুরুষ তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক স্তরের পুরুষ অপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়া গিয়াছেন। যেমন গোরক্ষনাথ শিষ্য, মীননাথ গুরুর কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

(পত্রাবলী ১—পৃ ৬০—৬১)

* * *

গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধিতে দেখিবে না। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই গুরুরূপে শিষ্যকে কৃপা করিয়া থাকেন ; অতএব গুরুর মনুষ্যভাব এবং ভগবদ্ভাব দুইই আছে। মনুষ্যভাবে গুরু কোন বিষয় অনবধানতাবশতঃ অনবগত থাকিলেও ভগবদ্ভাবে জ্ঞাত থাকেন। মনুষ্যভাবে যে সর্বদা

পাতাতে সঞ্চারিত হইয়াছে সেই রস শুকাইতে যতদিন বিলম্ব হয় ততদিন পর্য্যন্ত বৃক্ষ তাজাই থাকে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ মহৎ-পাপ প্রবৃত্তি-যুক্ত পুরুষ সদ্‌গুরুর কৃপা পাইলেও তাহার পূর্বানুষ্ঠিত পাপের শক্তি তাহাকে বহু দিন চালিত করিয়া কষ্ট দেয়।.........

মৎস্যকে যেমন বড়শী বিদ্ধ হইবার পরই পারস্থিত পুরুষের হস্তগত বলা যায়, অথচ সে জলেই সন্তরন করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরু-শক্তির দ্বারা শিষ্য বিদ্ধ হইবার পর হইতেই সংসারে থাকিলেও শিষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্যও বটে। কারণ বৃক্ষের মূল ছেদন হইয়া গেলে বাহিরে সে জীবিত থাকিলেও বাস্তবিক সে মৃতই হইয়াছে। তদ্রূপ সংসারে ভোগের মধ্যে থাকিলেও শিষ্য মূলতঃ মুক্ত হইয়াছে। অপর গুরু সম্বন্ধে তাহা নহে। কারণ মুক্তি তাহাদের আয়ত্ত নহে। সদগুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত শিষ্য্য অনধিক তিন জন্মে সংসার-সম্বন্ধ-রহিত অবশ্য হইবে। কিন্তু অপর গুরুর শিষ্য অনবরত সংসার-মার্গে প্রবর্তিত হইবে। স্বর্গাদি স্থানলাভ তাহাদের হইতে পারে; কিন্তু তথায় ভোগান্তে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আসিতে হইবে। জলে বড়্‌শীবিদ্ধ মৎস্য বিচরণ করে, অপর মৎস্যও বিচরণ করে—দেখিতে একই প্রকার, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেইরূপ সদ্‌গুরুর শিষ্য এবং অপর মনুষ্যও সংসারে আছে, দেখিতে প্রভেদ নাই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কোন স্ত্রীলোক যখন প্রথমে গর্ভধারণ করে, দেখিতে

তাহার সহিত অপর স্ত্রীলোকের প্রভেদ নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।—

(অপ্রকাশিত পত্রাবলী পৃ-৫-৮)

* * *

গুরুশক্তি যে একমাত্র ত্যাগী পুরুষকেই আশ্রয় করে এইরূপ নহে ; গৃহস্থ যদি নিবৃত্তিমার্গের শক্তিলাভ করিয়া থাকেন তবে তিনি শিষ্যকে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে কিছু দোষ হইবে না। সেই শিষ্যও নিবৃত্তি সম্প্রদায়ভুক্ত হইবে।…যে ঘট যেরূপ নির্মল সেই ঘটে ঐ গুরুশক্তি তদ্রূপ প্রকাশিত হইবে। স্বভাবতঃ অধিক নির্মল চিত্ত হইলে গুরুঘটে যদ্রূপ গুরুশক্তির প্রকাশ আছে তদপেক্ষা প্রকাশ শিষ্যের ঘটে হইতে পারে। গুরুপরম্পরা বিচার করিলে সর্বত্রই দেখিবে যে মধ্যে কোন কোন স্তরের পুরুষ তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক স্তরের পুরুষ অপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়া গিয়াছেন। যেমন গোরক্ষনাথ শিষ্য, মীননাথ গুরুর কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

(পত্রাবলী ১—পৃ ৬০—৬১)

* * *

গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধিতে দেখিবে না। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই গুরুরূপে শিষ্যকে কৃপা করিয়া থাকেন ; অতএব গুরুর মনুষ্যভাব এবং ভগবদ্ভাব দুইই আছে। মনুষ্যভাবে গুরু কোন বিষয় অনবধানতাবশতঃ অনবগত থাকিলেও ভগবদ্ভাবে জ্ঞাত থাকেন। মনুষ্যভাবে যে সর্বদা

সমস্ত জ্ঞাত থাকেন, তাহা নহে। এ বিষয়ে তত্ত্ব বোধগম্য করা কঠিন। (পত্রাবলী ২—পৃ ২৭০-৭০)

* * *

গুরুতত্ত্ব এই যে গুরু পরমাত্মাই ; পরমাত্মাই তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপী হইয়াছেন। (পত্রাবলী ১—১১৩)

* * *

গুরু ও গোবিন্দে একবুদ্ধি রক্ষা করাই শাস্ত্রীয় বিধি। গুরু ছাড়া গোবিন্দ নহেন ।...ভগবানই গুরুরূপে কৃপা করেন, অতএব উভয়ে একবুদ্ধি রাখিবে। ভগবৎ মূর্তি বর্তমানে রাখিয়া গুরুপূজা করিলে গুরুতে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বুদ্ধি স্থাপিত হইতে আরও সুবিধাই হইয়া থাকে। —(পত্রাবলী ১—পৃ ১৯৪-৯৫)

* * *

গুরু কেবল এক বিশেষ দেহে আবদ্ধ নহেন, তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন ইহা জানিবে। যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তোমাকে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন, সেই দেহ কখন চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে মাত্র গুরুবুদ্ধি করিলে গুরুতত্ব প্রকাশিত হয় নাই জানিবে। সর্বজীবে ভগবান্ বুদ্ধিতে সেবাভাব রাখিলে গুরুদেহ অবর্তমানেও তদ্দারাই গুরুসেবারূপ ভগবৎ সেবা হয়। অবশ্য দেহও বিশেষ আদরণীয় কারণ ইহা অবলম্বনে গুরু তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু এই দেহমাত্র তিনি নহেন, তিনি আত্মস্বরূপ সেই এক সর্বব্যাপী পদার্থ। অতএব গুরু হইতে দূরে থাকিলেও গুরুসেবার অভাব হয় না, যদি এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা যায়। —(পত্রাবলী ১—পৃ ৮০)

* * *

বাস্তবিকপক্ষে জানিবে যে শ্রীশ্রীভগবান সদ্‌গুরুই যথার্থ আপন জন ; তিনি সর্বত্রই আছেন, সকল স্থান হইতেই কৃপা করিতে পারেন ও করিয়াছেন। তাঁহাতে আপন বুদ্ধি করিয়া তিনি সর্বদা নিকটে আছেন এই ধারণার অভ্যাস করিতে পারিলে শীঘ্রই তোমার সমস্ত তাপ দূর হইয়া যাইবে। — (পত্রবলী ১—পৃ ১৯৬

* * *

স্বপ্নেও অনেক সময় দেবতারা মন্ত্রদান করিয়া থাকেন এইরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে কিন্তু ইহাও শাস্ত্রের ব্যবস্থা যে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র পুনরায় মনুষ্য-গুরু হইতে গ্রহণ করিবে। মহাদেব হইতে আমার প্রথমে মন্ত্র পাওয়া, যাহা আমি জীবন-চরিতে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কার্য্যতই ঘটিয়াছিল। কেন তিনি নিজ দেহেই সম্পুর্ণ গুরুস্থান গ্রহণ করেন নাই তাহা তিনিই জানেন, ইহাতে তর্কের কোন স্থলে নাই। —পত্রাবলী ১—পৃ ৫৯-৬০

* * *

তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমার নিজের কোন শক্তি নাই। তবে আমাকে সদগুরু গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি এই (আমার) ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু হইয়াছেন এবং তোমাদের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিবেন। এই বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না। তিনি তোমার সমস্ত কার্য্য নিয়শ্চই দেখিতেছেন ; তাহা যে পরিমাণে তোমার চিত্ত নির্মল হইবে, সেই পরিমাণে তুমি নিজ অন্তরে বুঝিতে পারিবে। তুমি বুঝিবে যে তিনি

তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বিধান করিতেছেন। এতৎ সমস্ত অন্তরের সাক্ষ্যাৎ অনুভূতির বিষয় ; বাহিরের কথা শুনিয়া মন নিঃসংশয় হয় না।

(পত্রাবলী ২-পৃ২৮৪-৮৫)

সার সত্য

জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ভগবানের রূপ, সকল ঘটেই ভগবান পূর্ণরূপে আছেন। ইহাই সার সত্য জানিবে। তবে এই বুদ্ধি সহজে খুলে না, এই নিমিত্ত সদ্‌গুরু এবং শ্রীবিগ্রহে পূর্ণব্রহ্ম বুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করিতে হয়। তাহা করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভগবান প্রকাশিত হয়েন। গুরুরূপী ভগবানে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহা যিনি করিতে পারেন তিনি অচিরাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই সার সত্য জানিবে। —(পত্রাবলী ২-পৃ২৮৮)

* * *

অনন্ত জীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম ; তিনি অনন্ত শক্তিমান, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। তুমি আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই এই নানারূপে ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাই সার সত্য জানিবে। শ্রুতি স্বয়ং এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সকলে এক বাক্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা অনুভব করিতে সদা যত্ন করিবে। এই যত্নে সকল ঋষিকুল তোমার সহায়কারী হইবেন। (পত্রাবলী ১-পৃঃ ২৯২)